সকল উৎসাহী বৈষ্ণবের জন্য এই বই একটি বাস্তব দিকনির্দেশক। যে সব গৃহস্থের পক্ষে আশ্রমে বসবাস করে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ সম্ভব নয় তাদের জন্য বইটি বিশেষভাবে উপযোগী। এতে সহজ সরল ভাষায় কীর্তন, জপ, পূজা, একাদশী পালন, দীক্ষা, সদাচার ইত্যাদি বিষয়ে মূল দিকনির্দেশিকা দেয়া হয়েছে। সকলের মধ্যে যাতে একনিষ্ঠ কৃষ্ণভক্তি জাগ্রত হয় তার সহায়তাকল্পে এই পুস্তক রচিত।
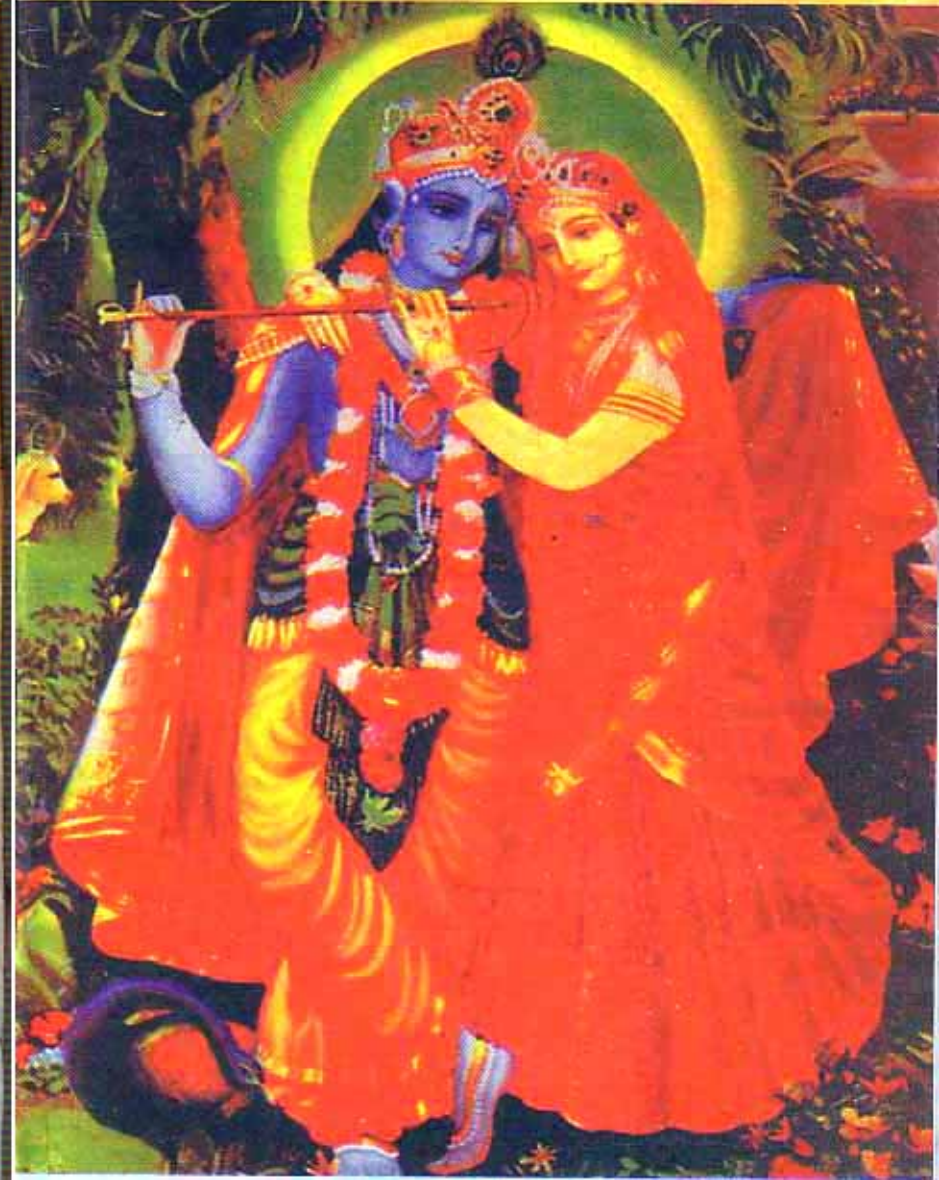
বৈষ্ণব শিক্ষা ও সাধনা

শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বৈষ্ণব শিক্ষা ও সাধনা

শ্রীমৎ ভক্তিবিকাশ স্বামী মহারাজ
প্রণীত

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাষ্ট
লস এঞ্জেলেস লণ্ডন ব্যাংকক্‌, ঢাকা।

শ্রী শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ রচিত গ্রন্থাবলী ঃ

শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ	আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর
লীলা পুরুষোত্তম শ্রী কৃষ্ণ	ঈশোপনিষদ
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু	অমৃতের সন্ধানে
শ্রী উপদেশামৃত	কৃষ্ণভাবনার অমৃত
বৈরাগ্য বিদ্যা	ভগবানের কথা
জীবন আসে জীবন থেকে	ভক্তিকথা
ভক্তি রত্নাবলী	গীতার গান
ভক্তি গীতি	ভগবৎ-দর্শন পত্রিকা

এই সমস্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠক ইচ্ছা করলে চৈতন্য সাংস্কৃতিব সঙ্ঘের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন ঃ

সেক্রেটারী, চৈতন্য সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ

ইস্কন স্বামীবাগ

৭৯,৭৯/১ স্বামীবাগ রোড, ঢাকা-১১০০, ফোন ৭১১৫৭৪৩

শ্রী পুণ্ডরীক ধাম

গ্রাম ঃ মেখলা পোঃ হাটহাজারি, চট্টগ্রাম

শ্রী শ্রী রূপসনাতন আশ্রম, পোঃ- মাগুরাইটা, জেলা-যশোর।

প্রকাশক ঃ

Bhaktivedanta Book Trust Bangladesh

প্রথম সংস্করণ ৫০১, গৌরাব্দ (১৯৮৭) ১০,০০০ কপি

দ্বিতীয় সংস্করণ ৫১২ গৌরাব্দ (১৯৯৮) ৫০০০০ কপি

তৃতীয় সংস্করণ ৫১৩ গৌরাব্দ (১৯৯৯) ৫,০০০ কপি

চতুর্থ সংস্করণ ৫১৫ গৌরাব্দ (২০০১) ৫,০০০ কপি

ভিক্ষা - ১৫ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

ACKNOWLEDGEMENT

Grateful thanks to Bhakta Barrie Jennions for his generous contribution towards the Publication of this book.

লেখক পরিচিতি ঃ

শ্রীমৎ ভক্তিবিকাশ স্বামী মহারাজ ১৯৫৭ সালে ইংল্যান্ডে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি ১৯৭৫ সালে বৃন্দাবনে শ্রীল প্রভুপাদের কাছ থেকে কৃষ্ণভাবনায় দীক্ষা নেন। এর আগে তাঁর নাম ছিল Hugh Turvey। তিনি ১৯৭৬ সালে কলকাতায় আসেন। ১৯৭৯ সালে তিনি প্রথমবারের মত বাংলাদেশে আসেন।

অনুবাদক পরিচিতি ঃ

চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণকারী সঞ্জীব চৌধুরী একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক। ১৯৭০ সাল থেকে তিনি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও করাচী হতে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে কাজ করে আসছেন। একজন সক্ষম অনুবাদক হিসাবে তাঁর খ্যাতি রয়েছে।

ভূমিকা ঃ

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পাঁচশ বছরেরও কিছু আগে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শীধাম মায়াপুরে আবির্ভূত হন। 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥' এই পবিত্র মহামন্ত্র কীর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি সকল স্তরের মানুষকে সর্বোচ্চ ভগবৎ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে শিক্ষা দেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, এই শিক্ষা একদিন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। শ্রীমৎ এ সি ভক্তিবেদন্ত স্বামী প্রভুপাদ (১৮৯৬-১৯৭৭) এর একক প্রচেষ্টায় প্রকৃতপক্ষে তা বাস্তব রুপ লাভ করে। তিনি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ গড়ে তোলেন এবং বিশ্বব্যাপী এর কর্মধারার প্রসার ঘটান।

এর ফলে বাঙালী বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসরণ করতে নতুন করে প্রেরণা পান। বিদেশীদের নিষ্ঠার সাথে ভাগবত ধর্ম পালন করতে দেখে বাংলাদেশের অনেক মানুষ অনুপ্রাণিত বোধ করেন এবং তাঁরাও এসব আচার অনুষ্ঠান পালন করতে চান। অবশ্য দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা এই যে সঠিক দিক নির্দেশনা খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। নিজেদেরকে সাধু বলে প্রচার করে থাকে, দুনিয়ার এমন লোকের অভাব নেই। এদের প্রায় সকলেই কিন্তু স্বার্থম্বেষী ভণ্ড 'অবতার' দার্শনিক ও গুরুর দল। সস্তা জনপ্রিয়তার পেছনে ধাবমান মেকি প্রেমভাবের অভিনয়কারী যে সব পেশাদার গুরু ধর্ম ব্যবসার মাধ্যমে পরিবার চালায় তাদের কেউ আমাদেরকে আধ্যাত্মিক অগ্রগতিতে কোনরকম সাহায্য করতে পারে না।

তাই কৃষ্ণভক্তি সম্পর্কে আন্তরিকভাবে আগ্রহী ব্যাক্তিদের সহায়তার জন্য এই পুস্তিকা রচিত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ লোকেরা পালন করতে পারে এমন সব সরল ও ব্যবহারিক নির্দেশ এই পুস্তিকায় দেয়া হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেকেই আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ করতে পারবে। এ সমস্ত নির্দেশের দার্শনিক পটভূমি এখানে খুব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়নি। শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ রচিত গ্রন্থসমূহে বৈষ্ণব দর্শনের পুংখানুপুংখ আলোচনা রয়েছে। এ ব্যাপারে আগ্রহী ব্যাক্তিদের তাঁর গ্রন্থগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়া অপরিহার্য।

বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী (শ্রীল রুপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী শ্রীলজবী গোস্বামী, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী) শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা হরিভক্তিবিলাস, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু এবং শ্রী উপদেশামৃত নামীয় গ্রন্থরাজিতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন সমস্ত গ্রন্থের নির্দেশাবলীর সার সংক্ষেপ এই পুস্তিকায় পাওয়া যাবে। গুরু পরম্পরায় এ সমস্ত নির্দেশ দেশ কাল পাত্রে উপযোগী করে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সমস্ত নির্দেশ পালনকারী যে কোন ব্যাক্তি কৃষ্ণ ভাবনামৃতের পথে তাদের অগ্রগতি নিজেরাই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

যাঁরা নিজেদেরকে শ্রীগৌরাঙ্গের অনুসারী বলে মনে করেন, তাঁদেরকে এই সাধনা আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করার জন্য আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাবো। শুধু নিজেকে সনাতন ধর্মাবলম্বী বলে দাবী করার মধ্যে তেমন গৌরবের কিছু নেই। যে ধর্মে আমরা বিশ্বাসী বলে দাবী করি তা অবশ্যই আমাদেরকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

আমাদের মুসলমানভাইগণ নিয়মিত নামাজ আদায় করে থাকেন। আমাদের খৃষ্টান ভাইদের সপ্তাহে অন্ততঃ একবার অবশ্যই গীর্জায় যেতে হয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুসারী হিসাবে আমরা কি করছি? যৎসামান্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুসারী আচার্যগণ নিত্য সাধনার জন্য আমাদেরকে বিস্তারিত কর্মসূচী দিয়ে গেছেন। কিন্তু কালের প্রভাবে উদাসীনতা ও অলসতার কারণে এ সমস্ত আচার অনুষ্ঠান আমরা ভুলে গেছি। এখন আমরা ধর্মসভা অথবা নাম যজ্ঞের মত বছরে দু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েই নিজেদেরকে বিরাট ধার্মিক বলে মনে করি। তাই প্রিয় পাঠকবৃন্দ, এই পুস্তিকাটি পড়েই আবার ভুলে যাবেন না। বরং এ সমস্ত আচার অনুষ্ঠানকে আপনার জীবন যাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে নিন। সকলের পক্ষে অতিদ্রুত আচার বিধি অর্জন হবার চেষ্টা করতে পারে। উদাহরণ স্বরুপ ঃ কেউ যদি আমিষ আহার ত্যাগ করে নিরামিষাষী হতে চায় তবে একেবারে না পারলে তার সপ্তাহে অন্তত একদিন নিরামিষ আহার করা উচিৎ। এভাবে সপ্তাহে দু'দিন তিন দিন করে একদিন সম্পূর্ণভাবে নিরামিষভোজী হতে পারবে।

শ্রী [illegible] মহাপ্রভুর বানী ঃ

জীব জাগো জীব গৌরচন্দ্র বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে॥
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি॥
ভারত ভুমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥

কীর্তন

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণ প্রেম' 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলেপায় প্রেম ধন"॥ (চৈতন্য চরিতামৃত)।
যখন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন, তিনি এদেশের জনগণকে
বিশেষভাবে এই বলে আশীর্বাদ করেছিলেন ঃ
হাসি' প্রভু সবা' প্রতি করিয়া আশ্বাস
কতদিন বঙ্গদেশে করিলা বিলাস॥
সেই ভাগ্যে অদ্যপিহ সর্ব-বঙ্গদেশে॥
শ্রীচৈতন্য সংকীর্তন করে স্ত্রী-পুরুষে ॥
কীর্তনের গুরুত্ব বলে শেষ করা যায় না। প্রত্যেকের উচিৎ যতবেশী সম্ভব
কীর্তনে নিয়োজিত থাকা।

কীর্তনের পদ্ধতি অত্যন্ত সরল। একজন কীর্তন করেন; পরে বাকী সবাই সমবেত কণ্ঠে তাকে অনুসরণ করেন। এসময় বাদ্যযন্ত্র বাজানো যায়। তবে বাদ্যযন্ত্র না থাকলে হাত তালি দিয়ে কীর্তন করাই যথেষ্ঠ। আমরা কত সুন্দর গাইতে পারি অথবা কত চমৎকারভাবে খোল-করতাল বাজাতে পারি কৃষ্ণ তা দেখেন না। তিনি দেখেন সরলভাবে মানসিকতার আমাদের আছে কিনা।

কোন কোন সময় ভক্তরা বাদ্য বাজনার প্রতি বেশী মনোযোগী হয়ে পড়েন। কিন্তু আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন হচ্ছে সেই নাম যা আমরা কীর্তন করছি। সঙ্গীতের দক্ষতা আমাদের কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারে না। তাই জটিল সুরে কীর্তন করার প্রয়োজন নেই।

মাঝে মাঝে ভক্তরা উত্তেজিত হয়ে এত জোরে বাজনা বাজান এবং এমন উন্মাত্তভাবে নাচতে থাকেন যে, কৃষ্ণনাম প্রায় শুনাই যায় না। কিন্তু নামই যদি শোনা না গেল তবে বাজনা এবং নৃত্যের স্বার্থকতা কোথায়?

কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম-হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম রাম হরে হরে।

এই মহামন্ত্র প্রাচীন শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এ ব্যপারে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা অন্য কোন 'নতুন' আবিকৃত মন্ত্র দিয়ে এর পরিবর্তন করতে পারি না। তা হবে বোকামী।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীতৃনের আগে কয়েকবার নিম্নোক্তভাবে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও তাঁর ঘনিষ্ঠ পাষদদের নামকীর্তন করা উচিৎ ঃ

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ॥

অন্যান্য স্বীকৃত ভজনও অবশ্য কীর্তন করা যায়। তবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গীত, নৃত্য ও বাজনা কীর্তনের অঙ্গ। এর সবকিছুই কৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য।

শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন কি জয়!

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ

প্রভু বলে- "কৃষ্ণ ভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণনাম-গুণ বই না বলিহ আর॥"
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ' হরিষে॥
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

প্রভু বলে- "কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব -সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর॥" (চৈতঃ ভাঃ)
কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এইত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥ (চৈঃ চঃ)

"প্রত্যেক ভক্তের জন্য নাম জপ অপরিহার্য। চৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন সুনির্দিষ্ট সংখ্যকবার মহামন্ত্র জপ করতেন। ষড়গোস্বামীগণ চৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে। হরিদাস ঠাকুরও এই নীতিমালা অনুসরণ করতেন। অন্যান্য দায়িত্ব পালন ছাড়াও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন সুনির্দিষ্ট সংখ্যক বার পবিত্র নাম জপের নিয়ম প্রবর্তন করেন। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুসারী ভক্তদেরকে প্রতিদিন অবশ্যই ১৬বার মালা জপ করতে হবে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘও নাম জপের এই সংখ্যা নির্ধারিত করেছে। হরিদাস ঠাকুর প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম জপ করতেন। ১৬ মালা জপ করতে প্রায় ২৮ হাজার নাম জপ করা হয়। হরিদাস ঠাকুর অথবা অন্যান্য গোস্বামীদের অনুকরণ করার দরকার নেই। তবে প্রতিদিন সুনির্দিষ্ট সংখ্যকবার নাম জপ প্রত্যেক ভক্তের অবশ্য কর্তব্য।

বৈষ্ণব গুরুর নির্দেশে কাউকে অন্যান্য দায়িত্বও পালন করতে হতে পারে। কিন্তু তাকে অবশ্যই প্রতমতঃ বৈষ্ণব গুরুর সুনির্দিষ্ট সংখ্যকবার মালা জপ করার আদেশ পালন করতে হবে। আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা স্থির করছি যে শিক্ষানবীশরা প্রতিদিন কম পক্ষে ১৬ মালা জপ করবে। যদি কেউ কৃষ্ণকে মনে রাখতে চায় এবং ভুলে যেতে না চায় তবে প্রতিদিন নাম জপ একান্তভাবেই প্রয়োজন। সকল বাধ্যবাধকতার মধ্যে কমপক্ষে প্রতিদিন ১৬ মালা নাম জপ সংক্রান্ত গুরুর আদেশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

জপের সাথে উপর নীচের দুই ওষ্ঠ এবং জিহবার ক্রিয়া জড়িত। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের সাথে এই তিনটি প্রত্যঙ্গ অবশ্যই সক্রিয় থাকতে হবে। হরে কৃষ্ণ শব্দগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে শুনতে পাওয়ার মত করে উচ্চারণ করা উচিৎ। কোন কোন সময় কেউ কেউ ওষ্ঠদ্বয় ও জিহবার সাহায্যে সঠিক উচ্চারণ জপ করার পরিবর্তে কোন মতে একটা যান্ত্রিক শব্দ মুখ দিয়ে বের করে। জপ অত্যন্ত সহজ। তবে নিষ্ঠার সাথে এর অনুশীলন করতে হয়। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র অবশ্যই এই ভাবে জপ করা উচিৎ যাতে উচ্চারণকারী নিজে সেই শব্দ শুনতে পায়।" (শ্রীল প্রভুপাদ)।

জপমালার ব্যবহার ঃ

প্রধানতঃ তুলসী গাছ দিয়ে জপমালা তৈরী করা হয়। নিম অথবা বেলগাছ দিয়েও জপমালা বানানো যায়। নামজপের সময় জপমালা ডান হাতে ধরতে হবে। (ছবি দেখুন)

মালার মধ্যে একটি প্রধান দানা এবং অপর ১০৮ টি দানা থাকে। প্রধান দানাটি অন্যান্য দানার চেয়ে আকারে বড়। প্রধান দানাটির পার্শ্বের প্রথম বড় দানাটি ডান হাতের মধ্যমা এবং বৃদ্ধাংগুলি দিয়ে ধরতে হবে। (তর্জনী যেন কোন অবস্থাতেই দানা স্পর্শ না করে সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে)।
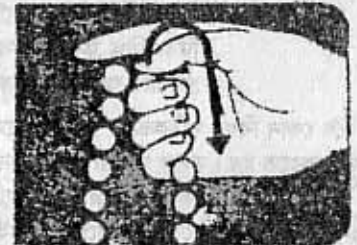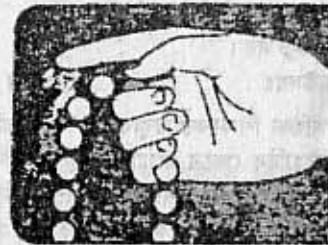
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ শুরু করার আগে 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ॥"- এই মন্ত্র একবার অথবা দু'বার জপ করতে হবে। নিরাপরাধ ভাবে নাম জপ করার জন্য মহাপ্রভু এবং তার পারিষদবর্গের আশীর্বাদ কামনায় এই মন্ত্র জপ করা উচিৎ।

তারপর "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই মহামন্ত্র শুদ্ধ ও সুস্পষ্ট ভাবে উচ্চরণ করতে হবে। জপের সময় উচ্চারিত মন্ত্রের প্রত্যেকটি শব্দের প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ।

একবার গোটা মন্ত্র জপ করা হলে বৃদ্ধাংগুলি এবং মধ্যমাংগুল দিয়ে পরবর্তী দানটি ধরা এবং আবার মন্ত্র জপ করা নিয়ম। ১০৮ বার মন্ত্র জপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এভাবে একের পর এক দানা ধরে ধরে জপ করা হয়। এভবে প্রধান দানার অপর পার্শ্বে এসে পৌছলে একবার মালাজপ শেষ হয়। একবার মালা জপ শেষ হলে পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র জপ করে নতুনভাবে মালাজপ শুরু করা নিয়ম। প্রধান দানাটি ধরে নাম জপ করার নিয়ম নেই। জপ অব্যাহত রাখার জন্য প্রধান দানা অতিক্রম করে পরবর্তী দানাতে হাত দেওয়া উচিৎ নয়। বরং গোটা জপ মালা ঘুরিয়ে নিয়ে আবার উল্টাদিক থেকে এক একটি করে দানা ধরে নাম জপ করতে হয়। এভাবে প্রথম বার মালা জপের সময় যে দানাটি সবার শেষে ছিল দ্বিতীয় বার জপের সময়ে সে দানাটি সবার আগে পড়বে। জপ করতে করতে আবার প্রধান দানা পর্যন্ত পৌছলে দ্বিতীয় বার মালা শেষ হয়। আবার দিক পরিবর্তন করে একইভাবে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ ইত্যাদি বার মালাজপ সম্পূর্ণ করা যায়। যদি কেউ প্রতিদিন ১৬ বার মালা জপ সম্পূর্ণ করতে না পারে তবে সে নিয়মিত ৮ অথবা ৪ বার এমন কি কমপক্ষে ১ অথবা বারও মালা জপ করতে পারে। নিদিষ্ট সংখ্যকবার নিয়মিত জপের অভ্যাস করার পর সেই সংখ্যা কমানো উচিৎ নয়। বরং প্রতিদিন কম পক্ষে ১৬ বার মালা জপের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তার উচিৎ মালা জপের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করা।

জপমালা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে ব্যবহার করতে হয়। পরিস্কার জায়গায় মালা রাখা উচিৎ। সবচেয়ে ভাল হয় থলের মধ্যে পুরে রাখলে।

কৃষ্ণ কথা শ্রবণ ও প্রচার

শ্রবণের মাধ্যমে কৃষ্ণ ভক্তির উন্মেষ ঘটে।
নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥ (চৈঃ চঃ)

যে কোন বিষয় সঠিকভাবে জানতে হলে অভিজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তা নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হয়। তাকে অবশ্য সেই জ্ঞান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এভাবে যখন কেউ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেন, তিনি তখন অন্য জনকে শিক্ষা দিতে পারেন। কৃষ্ণ ভাবনামৃতের বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। একামাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে সঠিকভাবে শ্রবণ ও অনুধাবনের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক সিদ্ধি অর্জনের পরও কথা শ্রবণ অব্যাহত রাখেন। কারণ তা নির্মল আনন্দ দান করে। কৃষ্ণ অসীম বিধায় কৃষ্ণ কথাও কোন গন্ডীতে আবদ্ধ নয়। বহুবার শ্রবণের পরও কোন ভক্ত একই বিষয় থেকে নতুন নতুন উপলব্ধি পেতে পারেন।

তাই প্রতিটি বৈষ্ণবের উচিৎ ভক্তিশাস্ত্রসমূহ পাঠ ও রসাস্বাদন করা বাঙলা ভাষায় এ ধরনের সাহিত্যের বিরাট রত্ন ভাণ্ডার রয়েছে। যথাঃ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল, শ্রীল নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের গ্রন্থসমূহ পাঠ করাও অত্যাবশ্যক। ভগবদ গীতা যথাযথ, শ্রীমদ ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীঈশোপনিষদ, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, শ্রীউপদেশামৃত, ইত্যাদি বিপুল সংখ্যক বৈষ্ণব সাহিত্য তিনি উপহার দিয়ে গেছেন। এসব গ্রন্থে পূর্বের বৈষ্ণবাচার্যদের টীকা অনুসরণ করে সুচিন্তিত তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে যাতে বর্তমানে সময়ের মানুষ তা সহজে বুঝতে পারে। রত্নসদৃশ এ সমস্ত গ্রন্থ নিজে ব্যক্তিগতভাবে পড়া যায়। আবার অভিজ্ঞ ভক্তের কাছ থেকে তার ব্যাখ্যা ও শ্রবণ করা যায়। ভাগবত পড় দিয়ে ভাগবত স্থানে।' প্রকৃত ভক্তদের কাছ থেকেই আমাদের শ্রবণ করা উচিৎ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পন্থার অনুসারী নয় এমন জড়বাদী পন্ডিত অথবা সুদক্ষ বক্তার কথা শুনে কৃষ্ণকে অনুধাবন করা যাবে না।

দেখা যায় যেকোন লোক প্রত্যহ শাস্ত্রপাঠ করেন। কিন্তু তাড়াহুড়া করে দায়সারাভাবে তারা তা করে থাকেন। তারা এই ভেবে আনন্দ পান যে আমি প্রতিদিন গীতা পাঠ করছি। কিন্তু অর্থ উপলব্ধির জন্যে পুরো মনোযোগ দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করতে হয় এটাকেই 'শ্রবণ' বলে। যদি কেউ নিয়মিত কৃষ্ণকথা শুনে এবং আন্তরিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করে তবে সে অপরকে তা ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা অর্জন করে। ভক্তদের শুধু নিজনিজ ভজনের মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিৎ নয়। বরং অন্যান্য ভক্তের সহযোগীতায় এই পবিত্র বার্তা সবর্ত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া তাদের কর্তব্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন: 'যারে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এইদেশ॥ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করে যে কেউ মহত্তম সমাজকল্যাণের কাজ করতে পারেন। এধরণের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত অবশ্যই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আর্শীবাদ লাভ করবেন।

তিলক

বৈষ্ণবের পক্ষে নিজেকে তিলক দিয়ে সজ্জিত করা অত্যাবশ্যক। মন্ত্রোচারণের মধ্যদিয়ে যারা তিলক ধারণ করেন কৃষ্ণ তাদের রক্ষা করেন। তিলকধারীরা বৈষ্ণবতার প্রতি তাঁদের সুদৃঢ় আস্থা ঘোষনা করেন এবং একই সঙ্গে তাঁদেরকে দেখলে অন্যের মনেও বিষ্ণু স্মৃতি জেগে উঠে। তিলক ব্যবহারের জন্য গোপীচন্দন সর্বোৎকৃষ্ট। এটা এক ধরনের হলুদ কাদা মাটি। নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে এই মাটি বিক্রি হয়। বাংলাদেশের ধর্মীয় মেলাগুলোতে এক ধরনের তিলক মাটি পাওয়া যায়।

এগুলোকেও গোপীচন্দন বলে। বৃন্দাবনের রাধা কুণ্ড মাটিও এ ব্যাপারে চমৎকার। তুলসী মাটিও প্রথম শ্রেণীর। এর কিছুই পাওয়া না গেলে নদীতীরের অথবা পুকুরের মাটি তিলক হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

হাতের বাম তালুতে অল্প জল নিয়ে সেই জলে তিলকমাটি ঘষতে হয়। এতে যে কাদা সৃষ্টি হয় তা মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে অনামিকা আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা শরীরের ১২ টি স্থানে লেপন করতে হয়। যথা ঃ-

তিলকচিহ্ন

কপালে- ওঁ কেশবায় নমঃ।
পেটে- ওঁ নারায়নায় নমঃ।
বুকে- ওঁ মাধবায় নমঃ।
গলায়- ওঁ গোবিন্দায় নমঃ।
ডান পার্শ্বে- ওঁ মধুসূধনায় নমঃ।
ডান বাহুতে- ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ।
বাম পার্শ্বে- ওঁ বামনায় নমঃ।
বাম বাহুতে- ওঁ শ্রীধরায় নমঃ।
বাম কাঁধে- ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ।
পিঠের নীচের দিকে- ওঁ দামোদরায় নমঃ।

এর পর হাত ধুয়ে ফেলে হাতের অবশিষ্ট জল মাথায় পেছন দিকে শিখার কাছে ওঁ বাসুদেবায় নমঃ মন্ত্র উচ্চারণ করে মুছে ফেলতে হবে। দুই ভ্রুএর মধ্য ভাগ থেকে উর্ধ্বে চুলের গোড়া পর্যন্ত এবং নীচে নাকের তিন চতুর্থাংশ পর্যন্ত তিলক বিস্তৃত হবে। দুই ভ্রুএর মাঝখান থেকে উপরদিকে তিলকের মধ্যখানে ফাঁকা জায়গা থাকবে। এটা অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে, যেন শরীরের ১২ টি স্থানেই খাড়াভাবে তিলক মাটি লেপন করা হয়।

তিলকের আকৃতি বুঝতে সুবিধার জন্য একটি চিত্র দেওয়া হলো।

তিলক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতীক চিহ্ন। শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে যে, শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে তিলক ধারণ করলে বিভিন্ন ভাবে কৃষ্ণের আর্শীবাদ লাভ করা যায়। অপরদিকে শাস্ত্রীয় রীতি ভঙ্গ করে তিলক ধারণ করলে নানান অমঙ্গলের সম্মুখীন হতে হয়। বাংলাদেশে কয়েকটি অপসম্প্রদায় তিলক ধারণের নিজস্ব পদ্ধতি অবিষ্কার করে সেই অনুযায়ী ভক্তদের বিভ্রান্ত করছে। এ ব্যাপারে প্রত্যেক বৈষ্ণবের সতর্ক থাকা উচিৎ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

মন্দির

মন্দির বললে বাংলায় জনসাধারণের মন্দির বুঝায়। বাড়ীতে পূজার ব্যবস্থা থাকলে তাকে ঠাকুর ঘর অথবা পূজামণ্ডপ নামে অভিহিত করা হয়।

শাস্ত্র অনুসারে বাড়ীতে এবং মন্দিরে পূজার মান ভিন্ন ভিন্ন। বাড়ীতে সঠিক সময়সূচী অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক নয়। তবে পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ আছে এমন মন্দিরসমূহের দিকে কমপক্ষে পাঁচবার ভোগ নিবেদন ও আরতি করতে হয়। তবে বাড়ীতে পরিবারের খাবার প্রয়োজনে যা রান্না হয় তাই নিবেদন করা যায়।

প্রত্যেক বৈষ্ণবের নিয়মিত মন্দিরে যাওয়া উচিৎ। তিনি বাসগৃহে একটি ঠাকুরঘর তৈরী করে নিতে পারেন। একই এলাকার কয়েকজন বৈষ্ণব থাকলে তাঁরা মিলিতভাবেও একটা মন্দির নির্মাণ করতে পারেন।

মন্দির সাদাসিধা অথবা জাঁকজমনপূর্ণ হতে পারে। তবে মন্দির সবসময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। শাস্ত্রে আছে যিনি মন্দির পরিস্কার করেন তাঁর হৃদয় পরিস্কার হয় ভগবানের জন্য নির্দিষ্ট এটা একটা পবিত্র স্থান। সেখানে কোন বাজে কথা অথবা উচ্চস্বরে চিৎকার চলতে দেয়া যায় না। মন্দিরে ধূমপান নিষিদ্ধ। এখানে কীর্ত্তন গানকে উৎসাহিত করা উচিৎ। তবে পল্লীগীতি, সিনেমার গান অথবা অন্যান্য সাধারণ গান চলতে পারবে না। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কীর্ত্তন ব্যতীত আর কোন গান বাজনা মন্দিরে নিষিদ্ধ। মন্দিরে উপস্থিত হয়ে ভক্তরা ইশ্বরের প্রতি পুরোপুরি মনোনিবেশ করবেন। এভাবে মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করতে হয়। অবৈষ্ণব আচরন (যেমন ঃ- মাছ খাওয়া) ত্যাগ করতে না পারা পর্যন্ত বাড়ীতে বিগ্রহ স্থাপন উচিৎ নয়। এ ধরনের কারও বাড়ীতে বিগ্রহ থাকলে পূজার উচ্চমান বজায় রাখা উচিৎ।

শুদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর অবতার, অন্তরঙ্গ শক্তি এবং শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ বিগ্রহ ও ছবির মাধ্যমে পূজিত হতে পারেন। অন্যান্য দেবদেবীসহ কৃষ্ণপূজার প্রচলিত আচার শাস্ত্র অনুমোদিত নয়। অন্যান্য দেবদেবীকে সম্মান করলেও ভক্তরা একথা জানেন যে, কৃষ্ণের তুলনায় এসব দেবদেবীর তেমন কোন গুরুত্ব নেই। তাই তারা একনিষ্ঠভাবে একমাত্র কৃষ্ণ পূজাই করে থাকেন।

পূজার বেদীতে চিত্রপটসমূহ স্থাপন করার ব্যাপারে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। রাধাকৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্বের পূজনীয়। তাই পঞ্চতত্ত্বের চিত্রপট যুগল মূর্ত্তির নীচে স্থাপন করতে হবে। (পৃথক সিংহাসনে রাখতে হবে) একইভাবে পঞ্চতত্ত্ব এবং রাধাকৃষ্ণ এবং রাধাকৃষ্ণ আচার্যগণের পূজনীয়। তাই তাঁদের চিত্রপট পঞ্চতত্ত্বের নীচে রাখতে হবে। রাধাকৃষ্ণ চিত্রপট সিংহাসনে রাখা ভাল। তবে সিংহাসন না থাকলেও তা দোষণীয় নয়। কিন্তু মূর্তিসমূহ অতিঅবশ্যই সিংহাসনের উপর স্থাপন করতে হবে। ছবিতে এর কিছু নমুনা দেখানো হলো ঃ-

নীচে শ্রীমৎ এ সি ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ও অন্যান্য গুরুপরম্পরা ধারায় আচার্যবৃন্দের চিত্রপট।
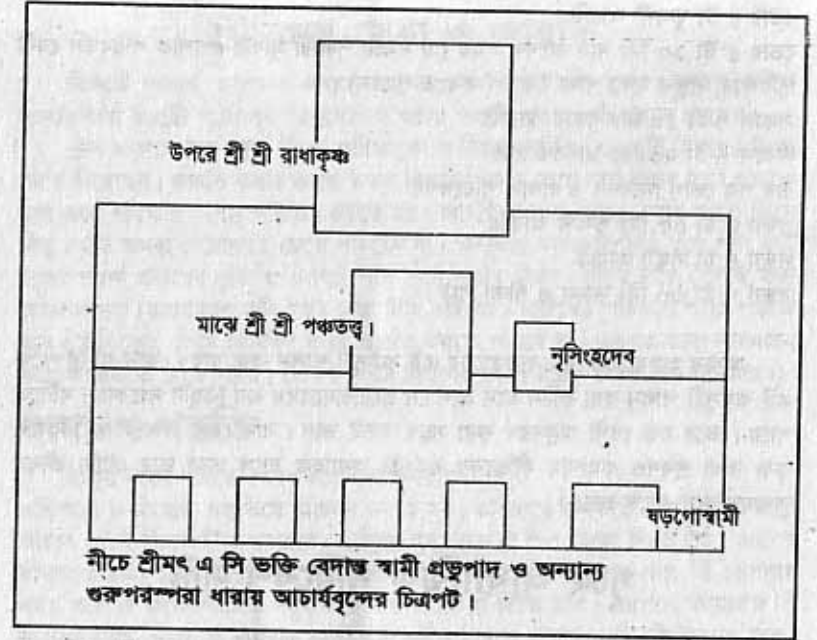
মন্দিরের অভ্যন্তরে আচরণ সম্পর্কে অনেক বিধি-নিষেধ রয়েছে। যেমন ঃ- বিগ্রহের সামনে খাওয়া চলবে না, বিগ্রহকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকরা চলবে না ইত্যাদি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের 'বর্জনীয় অপরাধ' নামের পরিচ্ছেদ পড়তে পারেন।

মন্দিরের কর্মসূচী

ঐতিহ্যগতভাবে মন্দির সমূহের তৎপরতার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী রয়েছে। এ ধরনের কর্মসূচী প্রতিদিন নিষ্ঠার সাথে পালন করলে তাতে মনকে কৃষ্ণ ভাবনায় স্থাপিত করতে খুব সাহায্য হয়। খুব ভোরে উঠে সাধনা করা আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। বর্তমান কালের মানুষ ব্রাহ্মমুহূর্তের গুরুত্ব ভুলে গেছে। কিন্তু এর বিপুল আধ্যাত্মিক সঞ্জীবনী শক্তি রয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, যে ব্যক্তি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে না, সে আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে আন্তরিক নয়।

বিশ্বের সর্বত্র ইসকনের মন্দির সমূহের প্রচলিত কর্মসূচী নিম্নরূপ ঃ-

ভোর ৪ টা ৩০ মিঃ মঙ্গলারতি

ভোর ৫ টা নৃসিংহ প্রার্থনা।

ভোর ৫ টা তুলসী আরতি
ভোর ৫ টা ১০ মিঃ নাম জপের সময় (এ সময়ে পূজারী মূর্তির পোশাক পরিবর্তন বেদী পরিস্কার, নতুন মালা গাথা ইত্যাদি করতে পারেন)।
সকাল ৭ টা ১০ মিঃ শৃঙ্গার-আরতি
সকাল ৭ টা ২০ মিঃ ভাগবত পাঠ
এর পর ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ পরিবেশন
সন্ধ্যা ৬ টা ৪৫ মিঃ তুলসী আরতি
সন্ধ্যা ৭ টা সন্ধ্যা আরতি
সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিঃ ভজন ও গীতা পাঠ।

মন্দির অথবা ভক্তদের বাসস্থানের এই কর্মসূচী পালন করা যায়। কোন গৃহীর পক্ষে এই কর্মসূচী পালন করা কঠিন মনে হলে সে প্রয়োজনবোধে এর কিছুটা সংকোচন ঘটাতে পারে। তবে যত বেশী অনুসরণ করা সম্ভব ততই ভাল। যদি কেউ সকালে ও বিকালে কৃষ্ণ কথা শ্রবণও কৃষ্ণনাম কীর্তনের কর্মসূচী অব্যাহত রাখে তবে তার গোটা জীবন কৃষ্ণময় হয়ে যেতে পারে।

গৃহে আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি

পরিবারের সকল সদস্যকে কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী এবং পিতা হিসেবে গৃহকর্তা তার পরিবারের গুরু। পরিবারের সকলের জন্য খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেমন তার কর্তব্য এগুলোর চেয়ে আরও বড় কর্তব্য হচ্ছে সকলকে কৃষ্ণ ভাবনার প্রশিক্ষণ দেয়া। অল্প বয়সে শিশুদের যদি কৃষ্ণ ভাবনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তবে স্বাভাবিক ভাবেই তারা ভক্তির চেতনা নিয়ে বড় হয়ে উঠবে। এর চেয়ে বড় কোন উপহার পিতামাতা তাদের সন্তানদের দিতে পারে না। যদি এভাবে গোটা পরিবার কৃষ্ণ ভাবনায় প্রশিক্ষণ পায় তবে বাড়ীর পরিবেশ স্বভাবতই অত্যন্ত সুন্দর রূপধারণ করবে।

নিজের বাড়ীকে কিভাবে কৃষ্ণভাবনাময় আশ্রমের মত পবিত্র করে তোলা যায়। তার কতিপয় নির্দেশ ঃ

কৃষ্ণ ভাবণাময় চিত্রপট সমূহ (অর্থা কৃষ্ণ, শ্রীল প্রভুপাদ ইত্যাদির চিত্রপট) টাঙ্গিয়ে রাখা এবং অন্যান্য কৃষ্ণ ভাবনাহীন ছবি সমূহ অপসারিত করা। রেডিও শোনার পরিবর্তে শুদ্ধ ভক্তদের গাওয়া ভজন শ্রবণ করা। বাজে কথার পরিবর্তে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা অথবা কৃষ্ণ কথা আলোচনা করা। সব কিছু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। কুটগন্ধ সবকিছুকে অপবিত্র করে ফেলে। গ্রন্থ, করতাল ইত্যাদি পবিত্র সামগ্রী অত্যন্ত যত্নের সাথে রাখতে হবে। এগুলো মাটিতে অথবা পা রাখার স্থানে রাখা যাবে না।

শ্রীবিগ্রহ সেবা ও আরতি

বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে সংক্ষেপে তা বর্ণনা করা হলো। আরও অধিক জানার জন্য আগ্রহী পাঠকগণ অনুমোদিত অর্চনা পদ্ধতি পুস্তক পাঠ করতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদ সবকিছুর উর্ধ্বে পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মানুবর্তিতা এই দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন। আরতি করার আগে অথবা বিগ্রহের জন্য ভোগ রান্না করার পূর্বে ভক্তকে স্নান করে পরিস্কার কাপড় পরিধান করতে হয়। আরতি (অথবা রান্না) করার আগে তিনে কিছু খেতে অথবা শৌচাগারে যেতে পারবেন না। অন্যথায় তাকে অপবিত্র বলে গণ্য করা হবে। পুরুষ ভক্তদের ধুতি ও গলবস্ত্র পরে পূজা করার নিয়ম। ঠাকুর ঘরে সেলাই করা কোন কাপড় (জপমালার থলি সহ) নেয়া বিধি বহির্ভূত। নারীদের পরিস্কার শাড়ী পড়তে হবে। মাসিকের প্রথম তিনদিন তারা আরতি করতে পারবে না। এরপর তারা অবগাহন করে আরতিতে যেতে পারে। (একই নিয়ম বিগ্রহের ভোগ রান্নার বেলাতেও প্রযোজ্য।)

সাধারণ পদ্ধতি

ঠাকুর ঘরের বাইরে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করতে হবে।
শুদ্ধিকরণ ঃ- নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে আচমন করতে হয়। ডানহাতে জলভর্তি একটি চামচ নিয়ে তাহার থেকে তিনফোঁটাজল বামহাতে দিয়ে শুদ্ধ করে ঐ জল ফেলে দিতে হয়। এরপর বামহাতে চামচ নিয়ে তিনফোঁটা জল ডাপনহাতের তালুতে দিতে হবে এবং 'ওঁ কেশবায় নমঃ' বলে ঐ জলের অর্ধেক গণ্ডুষ করে বাকীটা ফেলে দিতে হবে। এরপরে যথাক্রমে 'ওঁ নারায়ন নমঃ' এবং 'ওঁ মাধবায় নমঃ' বলে এই প্রক্রিয়ার দু'বার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। ডানহাতে তিনফোঁটা জল দিয়ে শুদ্ধ করে তা ফেলে দিতে হবে।

আরতি অনুষ্ঠানের সময় প্রতিটি সামগ্রিকে ব্যবহারের আগে তিনফোঁটা করে জল দিয়ে শুদ্ধ করে নিতে হয়। প্রতিটি দ্রব্য নিবেদন করার পর তিনফোঁটা করে জল দিয়ে শুদ্ধ করে নিতে হয়। আরতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহৃত দ্রব্যাদি পুনরায় পাত্রে রাখা যায় না। আরতি করার সময় পূজারী কাউকে স্পর্শ করতে পারে না। ভক্তদের হাতে ফুল দেওয়ার সময়ও তা উপর থেকে ফেলে দিতে হয়। প্রতিটি সামগ্রী বেদীতে নিবেদন করার পর তিনবার করে সমবেত ভক্তদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হয়। আরতি অনুষ্ঠান শুরুর আগে এবং শেষ হবার পরে ঠাকুর ঘরের বাইরে তিনবার করে শঙ্খ বাজাতে হয়।

আরতি করার ক্রমপর্যায়

শাস্ত্র ও ঐতিহ্য অনুযায়ী দুইটি প্রধান পদ্ধতি আছে। (১) ধূপাদি সকল দ্রব্য এক এক করে প্রথমে গুরু এবং এরপর পরমগুরু, নিত্যানন্দ প্রভু, চৈতন্য মহাপ্রভু, রাধারানী ও শেষে কৃষ্ণকে দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা সরাসরি কৃষ্ণকে অর্পণ করতে উপযুক্ত নই। সেজন্য প্রথমে গুরুর কাছে দেওয়া হয়, তারপর গুরুর পক্ষ হয়ে পরমগুরুকে দেওয়া হয়। এভাবে রাধার নিকট পৌছে এবং রাধা কৃষ্ণকে অর্পণ করে। (২) আরতির আগে পূজারী কৃষ্ণসেবা করতে গুরুর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন সে সকল দ্রব্য এক এক করে প্রথমে কৃষ্ণকে তারপর রাধা, চৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, পরম গুরু ও গুরুকে অর্পণ করে।

শ্রীল প্রভুপাদ স্থাপিত সকল মন্দিরে তিনি প্রথমোক্ত পদ্ধতিটি প্রচলন করেন।

পূর্ণাঙ্গ আরতির জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী

পিতলের থালা, পঞ্চপাত্র ও চামচ, শঙ্খ, ঘন্টা, তিনটি ধূপকাঠি, ঘৃতের পঞ্চপ্রদীপ, ছোট জলশঙ্খ, জলভর্তি ছোট ঘটি, কাপড় অথবা রুমাল, ফুলভর্তি থালা , চামর, ময়ূর পুচ্ছ, বাতি অথবা মোমবাতি এবং দিয়াশলাই।

পূর্ণাঙ্গ আরতির পদ্ধতি

১। দুই হাত পরিশুদ্ধ করে বাতি অথবা মোমবাতি জ্বালাতে হয়।
২। এরপর আচমন করতে হয়।
৩। শঙ্খ পরিশুদ্ধ করে তিনবার বাজিয়ে আবার পরিশুদ্ধ করে রেখে দিতে হয়।
৪। ঘন্টা পরিশুদ্ধ করে জ্বালিয়ে ৪ বার পাদপদ্মে দুবার নাভিতে এবং সাতবার শরীরের চারদিকে ঘুমিয়ে নিবেদন করতে হয়।
৫। ধুপকাঠি পরিশুদ্ধ করে জ্বালিয়ে ৪ বার পাদপদ্মে দুবার নাভিতে এবং সাতবার শরীরের চারদিকে ঘুরিয়ে নিবেদন করতে হয়।
৬। ঘৃত প্রদীপ পরিশুদ্ধ করে জ্বালিয়ে ৪ বার পাদপদ্মে ২ বার নাভিতে ৩ বার মস্তকে এবং ৭ বার শরীরের চারিদিকে ঘুরিয়ে নিবেদন করতে হয়।
৭। জল শঙ্খ পরিশুদ্ধ করে ঘটি থেকে জল নিয়ে পূর্ণ করতে হয়। এরপর নিবেদন করতে হয়। বেদীতে অবস্থিত প্রত্যেক বিগ্রহ এবং চিত্রপটে নিবেদন করার পর প্রতিবার সামান্য জল ঘটিতে ফেলতে হয়। প্রত্যেক বিগ্রহ অথবা চিত্রপটের মাথার উপর ৭ বার ঘুরিয়ে নিবেদন করতে হয়।
৮। ফুল পরিশুদ্ধ করে ৪ বার পাদপদ্মে নিবেদন করতে হয়।
৯। চামর পরিশুদ্ধ করে প্রতিটি বিগ্রহ অথবা চিত্রপটের সামনে ৫ অথবা ৭ বার দোলাতে হয়।
১০। শঙ্খ পরিশুদ্ধ করে (ঠাকুর ঘরের) বাইরে তিনবার বাজাতে হয়।
১১। আরতির সামগ্রী একত্র করে ধুয়ে ফেলতে হয়। পরিষ্কার কাপড় দিয়ে টেবিল এবং অন্য একটা কাপড় দিয়ে মেঝে মুছে ফেলতে হয়।

আরতি শুরুর সময় শঙ্খধ্বনির পর কালবিলম্ব না করে পুজারী পর্দা সরাবেন। বিগ্রহ দর্শনের পর সমবেত ভক্তগণ ভূমিষ্ঠ হয়ে দন্ডবৎ প্রণাম করবেন। ভূমি থেকে উঠে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন শুরু করবেন। আরতি শেষে শঙ্খ ধ্বনির পর কীর্তন বন্ধ হতে পারে অথবা আরও কিছু সময় চলতে পারে। তারপর প্রেমধ্বনি উচ্চারিত হবে এবং সকল ভক্ত আবার দন্ডবৎ করবেন।

আরও কয়েকটি বিষয়

বিগ্রহের প্রতি পূজারীর মনোভাব অত্যন্ত সম্মানজনক হতে হবে। আরতি প্রদান কালে পূজারী সোজা হয়ে দাঁড়াবে। শুধু তার ডান হাত (নিবেদন করার জন্য) এবং বাম হাত (ঘন্টা বাজাবার জন্য) নড়াচড়া করবে।

আরতি নিবেদনের সময় পূজারী বিগ্রহের প্রতি মনোযোগ সন্নিবেশিত করবে।

বিষ্ণু এবং বৈষ্ণব পূজায় নিম্নলিখিত ফুল ব্যবহার নিষিদ্ধ ঃ- রক্তজবা, গন্ধহীন, কটুগন্ধযুক্ত, শ্মশান জাত গাছের ফুল, যে কোন পূজিত গাছের ফুল, মাটিতে পড়ে থাকা ফুল, বাসি ফুল, ও ফুলের কলি এবং কৃত্রিম ফুল।

পূজা

শাস্ত্রে অনেকগুলো জটিল মন্ত্র ও মুদ্রাসহ পূজা পদ্ধতির সুবিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। তবে এর সবগুলো পালন করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীল প্রভুপাদ যখন পাশ্চাত্য দেশে প্রথম পূজা অনুষ্ঠান করেন তখন তিনি খুব সরল ভাবে পূজার পদ্ধতি দেখিয়েছিলেন। শিক্ষার শুরুতে যেমন প্রাথমিক অক্ষর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় ঠিক তেমনি ভাবে তিনি প্রাথমিক পূজার পদ্ধতি খুব সহজ ভাবে দেখিয়েছেন এবং ক্রমে ক্রমে যাতে উন্নত স্তরে উঠা যায় সে ব্যবস্তারও তিনি পথ নির্দেশ করেছেন।

খুব ভোরে (ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতির পর) ঠাকুর ঘরের মধ্যে প্রতিদিন পূজা করা হয়।

স্নান করে তিলক ধারণ করে পরিষ্কার কাপড় পরিধান করে পূজারী পূজার জন্য তৈরী হন। বিগ্রহ অথবা চিত্রপট দিয়ে পূজা করা হয়। প্রথমতঃ আগের দিনের সব বাসি ফুল সরিয়ে ফেলা হয়।

শাস্ত্র মতে পাঁচ, দশ, ষোল অথবা চৌষট্টি উপচার দিয়ে পূজা করার বিধি রয়েছে।

পঞ্চোপচার হচ্ছে, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ আর নৈবেদ্য। প্রত্যুষে মঙ্গলারতির পর শ্রীবিগ্রহের পোশাক পরিবর্তন করবেন।

পোশাক পরিবর্তনের আগে গুরুদেবের শ্রীচরণে ফুল দিয়ে পূজা করবেন এবং সেবার অধিকারের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করবেন। ধাতু বিগ্রহ স্নান করাতে পারেন কিন্তু মনিময় (পাথরের) দারুময় (কাঠের), মৃন্ময় (মাটির) বিগ্রহ এবং চিত্রপট বিগ্রহ মনে মনে স্নান করাবেন এবং তারপরে বিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ মার্জন করবেন। মনিময় বিগ্রহ সিক্ত বস্ত্রে এবং দারুময় ও মৃন্ময় বিগ্রহ শুকনো কাপড় দিয়ে মার্জন করবেন। এরপর শ্রী বিগ্রহকে নতুন পোশাকে সজ্জিত করবেন। শ্রী বিগ্রহের চরণে গন্ধদ্রব্য (চন্দন ও কর্পূর মিশ্রিত) প্রদান করে তার উপর তুলসী পাতা দেবেন। তারপর বেদী পরিষ্কার করে সকল চিত্রপট ও বিগ্রহের শ্রীচরণে গন্ধদ্রব্র ও ফুল দিয়ে পূজা করবেন। বিষ্ণুতত্ত্ব বিগ্রহের শ্রীচরণে তুলসী দেবেন এবং সমস্ত বেদীকে ফুল দিয়ে সাজাতে পারেন। তারপর ঠাকুরের ভোগ নিবেদন ও পূজা করার সময় বিভিন্ন স্তবস্তুতি পাঠ করতে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের 'ব্রহ্ম-সংহিতা, পাঠ করতে বলেছেন কিন্তু স্তোত্র যদি না জেনে থাকেন তাহলে পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র ও হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করবেন। এই পর্যায় পর্যন্ত কেউ ঠাকুর দর্শন করবেন না। ভোগ নিবেদনের পরে এমন ভাবে পর্দা খুলবেন যাতে সমবেত ভক্ত বৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের নবযৌবন রূপ দর্শন করতে পারেন। এই সময় ধূপ, দীপ, ফুল ও চামর দিয়ে আরতি করবেন।

তুলসী

"তুলসী সর্বমঙ্গলময়ী। তাঁকে দর্শন করলে, স্পর্শ করলে স্তবন করলে, বন্দনা করলে, তাঁর মহিমা শ্রবণ করলে অথবা রোপন করলে সবরকমের কল্যাণ লাভ করা যায়। এই প্রকার ন'টি বিধির মাধ্যমে তুলসীদেবীর সেবা করলে নিত্যকাল বৈকুণ্ঠজগতে বাস করা যায়।" (স্কন্দ পুরান)

তুলসী মঞ্চ না থাকলে টবের মধ্যে তুলসী দেবীকে স্থাপন করে সুন্দর পোশাক অথবা কাপড় দিয়ে সাজাতে হবে। সমস্ত বাসীফুল সরিয়ে ফেলতে হবে। তারপর মন্দির কক্ষের মধ্যখানে তুলসীদেবীকে নিয়ে আসতে হবে। প্রণাম করে নিম্নোক্ত প্রার্থনা সমবেতভাবে তিনবার উচ্চারণ করতে হবে-

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্যচ
বিষ্ণুভক্তি প্রদে দেবী সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥

তুলসী আরতির সময় মিন্দিরের পর্দা বন্ধ থাকবে। এরপর আরতি শুরু হবে এবং ভক্তগণ শ্রীতুলসী কীর্তন গাইবেন।

তুলসী আরতি ঃ

উপকরণ ঃ পিতলের থালা, পঞ্চপাত্র ও চামচ, ঘন্টা, ৩টা ধূপকাঠি, ঘৃতপ্রদীপ, ফুলভর্তি থালা, বাতি অথবা মোমবাতি এবং দিয়াশলাই। হাত পরিশুদ্ধ করে বাতি অথবা মোমবাতি জ্বালাতে হয়। তারপর আচমন করতে হয় এরপর ঘন্টা পরিশুদ্ধ করে বামহাতে তা বাজাতেহয়। ধূপকাঠি জ্বালিয়ে ৪ বার মূলে, ৭ বার সর্বাঙ্গের চারিদিকে এবং ৩ বার সমবেত ভক্তদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হবে।

প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ৪ বার পাদমূলে, ২ বার মাঝখানে ৩ বার উর্ধ্বে, ৭ বার সর্বাঙ্গের চারিদিকে এবং ৩ বার সমবেত ভক্তদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হবে।

ফুল পরিশুদ্ধ করে তারপর ৪ বার মূলে এবং ৩ বার সমবেত ভক্তদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হবে।

কিছু ফুল তুলসী দেবীর পাদমূলে অর্পণ করে বাকীগুলো সমবেত ভক্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে। এরপর আরতি সামগ্রী সংগ্রহ করে তা ধুয়ে ফেলতে হবে। পরিস্কার কাপড় দিয়ে টেবিল মুছে ফেলতে হবে এবং অন্য একটি কাপড় দিয়ে মেঝে মুছে ফেলতে হবে।

পূজাশেষে ভক্তগণ তুলসী পরিক্রমা (ঘড়ির কাঁটার অনুরুপ) করবেন। তারপর তিনফোঁটা জলে হাত পরিশুদ্ধ করে তিনফোঁটা জল তুলসী দেবীর পাদমূলে দেবেন এবং এরপর তাঁদের ভক্তি প্রদর্শন করবেন।

তুলসী সম্পর্কে আরো কিছু কথা

তুলসী পাতা সকালবেলা তুলতে হয় এবং শুধু একাজের জন্য একটি কাঁচি বিশেষভাবে সংরক্ষিত রাখতে হয়। আঘাত না পায় এমনি ভাবে যত্নের সাথে কাঁচি দিয়ে নতুন পত্র কোরকের উপরিভাগে কেটে তুলসীপাতা তুলতে হয়। তুলসীর লম্বা বোঁটা অথবা ডাল ছেদন অপরাধ।

তুলসী পাতা সকালবেলা তুলতে হয় এবং শুধু একাজের জন্য একটি কাঁচি বিশেষভাবে সংরক্ষিত রাখতে হয়। আঘাত না পায় এমনি ভাবে যত্নের সাথে কাঁচি দিয়ে নতুন পত্র দুইদিকে দুই পত্র মধ্যে কমল মঞ্জুরী উপরিভাগে কেটে তুলসীপাতা তুলতে হয়। তুলসীর লম্বা বোঁটা অথবা ডাল ছেদন করা অপরাধ।

সকল ভক্তের উচিৎ কয়েকটি তুলসী গাছ রাখা। তবে খুব সতর্কতার সাথে এগুলোর যত্ন করতে হবে। কারণ তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী। তুলসী দেবীকে এমন যায়গায় রাখতে হবে যাতে মানুষ অথবা পশু তাঁর উপর দিয়ে হেঁটে যেতে না পারে, তাঁকে দুমড়ে মুচড়ে দিতে না পারে। মঞ্জরী (নরম সবুজ কলির মত ফুল যা পরে বাদামী ও শক্ত হয়ে যায় এবং যার থেকে অনেকগুলো বীজ হয়) আর্বিভূত হবার সাথে সাথে সেগুলো কেটে নেয়া সবচেয়ে ভাল। এতেকরে আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেখানে সেখানে অনেকগুলো নতুন তুলসী চারা জন্মানো বন্ধ হবে। এতে গাছটি অত্যন্ত সুস্থ ও সবল ভাবে বেড়ে উঠবে।

শুধুমাত্র বিষ্ণুতত্ত্ব বিগ্রহসমুহ ও চিত্রপটসমূহের প্রতি তুলসী নিবেদন করা যায়। এমনকি রাধারাণী, গুরু অথবা বৈষ্ণবের চরণে তুলসী বিবেদন করা যায়না। পাতা এবং মঞ্জরী দিয়ে গাঁথা তুলসী মালা বিষ্ণুতত্ত্ব বিগ্রহসমূহ ও চিত্রপটসমূহের প্রতি নিবেদন করা হয়। তুলসীপাতা বিষ্ণুর চরনে নিবেদন করা হয়। বিষ্ণুকে ভোগ নিবেদন করার সময় প্রত্যেক সামগ্রীতে একটি করে তুলসীপাতা দেওয়া হয়। অন্য কোন দেবদেবীর ভোগে তুলসী পাতা দেয়া যায় না।

বিষ্ণুর ভোগ ছাড়া অন্য কোন খাদ্যে তুলসী পাতা দেয়া উচিৎ নয়। তা হবে অপরাধ। এমনকি ওষুধ হিসাবে তুলসী পাতা ব্যবহার করাও অপরাধ।

ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ গ্রহন

ভগবানকে নিবেদন করতে হয় কেন?

ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, যারা তাঁকে নিবেদন না করে খাদ্য গ্রহন করে তারা পাপ ছাড়া আর কিছুই ভক্ষন করেনা। আর যারা ভগবানকে বিবেদিত খাদ্যের অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করে তারা সকল পাপমূলক প্রতিক্রিয়া হতে মুক্ত থাকে। শরীর রক্ষার জন্য আমাদের সকলকে আহার গ্রহণ-করতে হয়। তাই যিনি আমাদের সবকিছু দিয়েছেন তাঁকে প্রথমে খাদ্য নিবেদন করিনা কেন? এটা পরীক্ষিত সত্য যে, ভগবানের উদ্দেশ্যে বিনেদিত খাদ্য অর্থাৎ প্রসাদের বিশেষ ধরনের স্বাদ হয়। অত্যন্ত বিলাসবহুল রেস্তোরাঁর খাবারেও এ স্বাদ পাওয়া যায়না। প্রসাদ গ্রহণ করার ফলে মানুষের গোটা অস্তিত্ব পবিত্র হয়ে যায় এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ঈশ্বরের আশীর্বাদসূচক এই অভিজ্ঞতা ভক্তির বহিঃপ্রকাশ। শুধুমাত্র মহাঋষিদের ভুক্তাবশেষ ভক্ষন করে এক চাকরাণীর যুবকপুত্র পরজন্মে নারদ মুনি হয়েছিলেন। প্রসাদের গুণ এত ব্যাপক।

কি নিবেদন করা যাবে এবং কি যাবে না

শুধুমাত্র নিরামিষ খাদ্য ভগবানকে বিনেদন করা যায়। ভগবদগীতায় উল্লেখ আছে ঃ

দুগ্ধজাত সামগ্রী, খাদ্যশস্য, ফল, সব্জী, বাদাম এবং চিনির মত দ্রব্যাদি সত্ত্বগুণযুক্ত খাদ্য। তাই এগুলো নিবেদন করার যোগ্য। এধরনের খাদ্য মানুষের অস্তিত্বকে পবিত্র করে; শক্তি, স্বাস্থ্য, সুখ, ও সন্তুষ্টি বাড়ায়।

মাংস, মাছ, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন, অত্যন্ত মসলাযুক্ত খাবার এবং ঝাঁঝযুক্ত খাবার তমোগুণ ও রজগুণ সম্পন্ন বিধায় এগুলো ভগবানকে নিবেদন করা যায় না। গীতায় উল্লেখ আছে যে, এসব খাদ্য দুঃখ, দুর্দশা ও রোগ বয়ে আনে।

ভোগ নিবেদন পদ্ধতি

ঠাকুরের ভোগ নিবেদনের জন্য পৃথক একটি বিশেষ থালা রাখতে হয়। এই থালা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা উচিৎ নয়। ভোগের যাবতীয় সামগ্রী এর উপর রাখা হয়। তরল ভোগ বাটিতে নিবেদন করা হয়। ঠাকুরের ভোগ যথাসম্ভব আকর্ষনীয় করার চেষ্টা চালানো উচিৎ। খাদ্যসামগ্রীর সাথে এক গ্লাস জলও নিবেদন করা হয়।চিত্রপটের সামনে বেদীতে থালা রেখে ভোগ নিবেদন করাই নিয়ম। প্রতিটি সামগ্রীতে একটি করে তুলসী পাতা নিতে হয়। এর পর আচমন সেরে প্রণাম করাই নিয়ম। প্রতিটি সামগ্রীতে একটি করে তুলসী পাতা দিতে হয়। এর পর আচমন সেরে প্রনাম করে ঘন্টা বাজিয়ে তিনবার হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র আবৃত্তি করতে হবে এবং মনে মনে প্রার্থনা করতে হবে কৃষ্ণ যেন ভোগ গ্রহণ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব গুরুদের কাছে থেকে দীক্ষা গ্রহণের পর ভোগ নিবেদনের সময় আরো বিস্তারিত মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়।

ভোগ নিবেদন অন্ততঃ ১৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এরপর ভোগের থালা বেদী থেকে সরিয়ে রান্নঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অন্য থালা ও বাটিতে নিবেদিত সামগ্রী বিতরনের জন্য রাখা হয়। এর পর ভোগের থালা ধুয়ে ফেলা হয়। কেউ এমনকি গুরুও কৃষ্ণের থালা থেকে সরাসরি খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন না। নিবেদনের জন্য প্রস্তুত করার সময় কখনও খাদ্য সামগ্রী খেয়ে দেখতে নাই।

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু একবার শ্রী অদ্বৈত প্রভুর গৃহে সুন্দর প্রসাদের ব্যবস্থা দেখে বললেন,-
ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণকে করায় ভোজন।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ ॥ (চৈঃ চঃ)

ভক্তরা শুধু কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করেন

কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণের মধ্যদিয়ে ভক্তরা আধ্যাত্মিকভাবে এগিয়ে যায়। অভক্তদের রান্না করা নিরামিষ খাদ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। চৈতন্য মহাপ্রভু বলেন ঃ "বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।" আমাদেরকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। যে সব ভক্ত কঠোরভাবে খাদ্যাভ্যাস মেনে চলে না তারা কখনও কৃষ্ণ ভাবনায় যথার্থভাবে অগ্রগতি লাভ করতে পারে না।

দোকান থেকে কেনা রুটি, বিস্কুট ইত্যাদি অবশ্য বর্জন করতে হবে। বরং কিছু সময় ব্যয় করে এবং কষ্ট স্বীকার করে আমাদের উচিৎ কৃষ্ণকে নিবেদন ও প্রসাদ গ্রহণের জন্য বাড়ীতেই কিছু রান্না করা।

ভ্রমণকালে নিবেদিত প্রসাদ সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। অথবা ফল, শুকনো বাদাম, ইত্যাদি কিনে নিয়ে নিবেদন করা যায়। ভ্রাম্যমান প্রচারকদের সাথে রান্নার পাত্র রাখলে ভাল হয়। শ্রীল প্রভুপাদ কোন কোন সময় প্রচারকদের আজীবন সদস্যদের (নিরামিষভোজী) বাসায় নিমন্ত্রণ গ্রহণের সম্মতি দিয়েছেন। যে সমস্ত গৃহস্থ ভক্ত পেশাগত কাজের জন্য ঘনঘন ভ্রমণে বাধ্য হয়, তারা খাবার সম্পর্কে প্রবীণ ভক্তদের সাথে পরামর্শ করে নিতে পারে।

প্রসাদ ফেলে দেয়া অপরাধ। তাই প্রসাদ বিতরণকারীর উচিৎ প্রত্যেককে অল্প অল্প করে প্রসাদ দেয়া এবং পূর্ণ তৃপ্তি সাধন না হওয়া পর্যন্ত বারে বারে তা দিয়ে যাওয়া।

রান্নার সরঞ্জামাদি বাছাই

রান্নার জন্য বিভিন্ন রকমের পাত্র রয়েছে। এগুলির গুণও ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। রান্নার জন্য মাটির পাত্র অত্যন্ত ভাল। যদি পাওয়া যায় তবে রান্নার জন্য মাটির পাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। পিতলের পাত্রও খুব ভাল। তবে তেতুল, টমেটো, দই, কাচা আম ইত্যাদির মত অম্লজাতীয় খাদ্যের বেলায় এসব পাত্র ব্যবহার করা উচিৎ নয়। কারণ এতে বিরুপ প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি হয়। স্টেনলেস স্টীলের পাত্রও খুব ভাল। এলুমিনিয়াম (বাংলায় যাকে ভুল করে সিলভার বলা হয় এর পাত্র সস্তা। তাই বাংলাদেশে রান্নার জন্য এই পাত্র ব্যপক ভাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এলুমিনিয়ামের পাত্র রান্নার জন্য মোটেই উপযোগী নয়। কারণ ইহা স্বাস্থ্যের উপর অত্যন্ত বিষাক্ত প্রভাব ফেলে। আমরা অবশ্যই ভগবান এবং তার ভক্তকে বিষাক্ত খাদ্য পরিবেশন করতে চাই না।

নিরামিষ আহার

শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর অধিকাংশ মানুষের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে আমিষ খাদ্যই আমাদের শরীরের জন্য উপযুক্ত। নিরামিষ খাদ্য শুধু বৈষ্ণব ও সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশু, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের শিষ্যদের নিরামিষ আহারের বিধান দিয়েছেন তাই তা শুধু ধার্মিক মানুষের পালনীয়, কিন্তু ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকেরা সুস্বাস্থ্য, শক্তিও কর্মক্ষম থাকার জন্য আমিষ খেতে পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের এই ধারণা ভুল। সুস্থ, সবল ও দীর্ঘায়ু থাকার জন্য নিরামিষ আহারই শ্রেয়, শাস্ত্রের এই নির্দেশের সঙ্গে বহু খ্যাতনামা চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকগণের মত অভিন্ন। প্লেটো, ডারউইন, পীথাগোরাস, নিউটন, বার্ণাড শ, টলষ্টয়, মিলটন সক্রেটিস, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, মহাত্মা গান্ধী, প্রমুখ বিখ্যাত মনীষীগণ নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করতেন।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় নিরামিষ খাদ্য বলতে সাত্ত্বিক আহারকেই বোঝানো হয়েছে। অতিরিক্ত টক, মিষ্টি, তিক্ত, কষযুক্ত, বাসি, শুকনো- এ ধরণের খাদ্য শাস্ত্রে বর্জন করতে বলা হয়েছে। বিভিন্ন খাদ্য-দ্রব্যকে সাত্ত্বিত, রাজসিক, এবং তামসিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এক এক শ্রেণীর খাদ্যের এক এক রকম গুণ। যে, যে শ্রেণীর গ্রহণ করে তার মন ও মনোবৃত্তির প্রকাশও সেইভাবে ঘটে। কেননা খাদ্যরস রক্ত, মাংস, মজ্জা, শুক্র ইত্যাদিকে পরিপুষ্ট করার মাধ্যমে সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রীতে ঐ খাদ্যরসের গুণকে সঞ্চারিত করে। ফলে দেহকোষগুলি ঐ খাদ্যরসের গুণদ্বারা চালিত হয়ে আমাদের চেতনা ও কর্মকে প্রভাবিত করে।

সূত সংহিতার ৪৬ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে অভক্ষ্য ভক্ষণে চিত্ত আপনিই অশুদ্ধ হয়। ফলে মানুষের ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়। আর ভ্রান্ত-জ্ঞানের ফলে তারা নিসিদ্ধ-কর্ম করতে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ পাপকর্মে আসক্ত হয়, কামপ্রবণতা বেড়ে যায়। অভক্ষ ভোজী, অনাচারী, আত্মনিয়ন্ত্রনহীন মানুষ পশু হয়ে ওঠে। তারা নিজের যেমন ভালো করতে পারে না, তেমনি অপরের ভালোও করতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক ও খাদ্য-বিশারদ্গণের মত অনুযায়ী উদ্ভিদ প্রোটিন ও অন্যান্য ভিটামিনযুক্ত খাদ্য সুস্থ ও দীর্ঘায়ু জীবনের জন্য যথেষ্ট। ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, (গীতা ১৭/৮)-

আয়ুঃসত্ত্ব বলারোগ্রসুখজীতিবির্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয় ॥

অর্থাৎ সত্ত্বগুনসম্পন্ন রসালো, স্নিগ্ধ আহার গ্রহণ করে মানুষ দীর্ঘায়ু, সবল হন। এছাড়া আরো বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমেও শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন যে সাত্ত্বিক আহার গ্রহণের মাধমে মানুষ উদ্যমী, ধৃতিযুক্ত, কর্মফলে নির্বিকার, অহংকার শূণ্য এবং রাগদ্বেষহীন হয়। রাজসিক আহার মানুষকে হিংস্র, শুচিহীনও কর্মফলককামী করে। (কাম, ক্রোধ এবং লোভ ত্রয় রজোগুণসমুদ্ভবঃ (গীতা ৩/৩৭) তামসিক খাদ্য মানুষকে শঠ, উদ্ধত, অলস, বিদ্বেষী ও বিষাদী করে তোলে।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে মাংসাশী প্রাণীর দাঁত ও নিরামিষভোজীদের দাঁতের গঠনে পার্থক্য রয়েছে। এছাড়া নিরামিষভোজীদের গাত্রচর্ম সচ্ছিদ্র এবং ঘর্মযুক্ত এবং মুখের লালা ক্ষারধর্মী। বিখ্যাত চিকিৎসক স্যার হেনরী টমসন (M. D. F. R. C. S.) বলেছেন নিরামিষ -ভোজীরা নিরামিষ খাদ্য থেকে তাদের জীবন ধারণ ও বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণই সংগ্রহ করতে পারে। প্রয়োজনীয় তাপ ও বলের জন্য নিরামিষ খাদ্যই যথেষ্ট। প্রচলিত প্রাণীজ আমিষ খাদ্য অপচয় মাত্র ও গুরুতর অনিষ্টের কারণ। প্রখ্যাত খাদ্যবিজ্ঞানী ফাউলারের মতে 'Meat blunts the morals, inflames the propensities of passion, unbalanced temperament etc, Whereas human Perfaction requires the Converse'. নিরামিষ খাদ্যগুণেই সবথেকে বেশী ক্যালরী পাওয়া যায়। হাতি নিরামিষাশী প্রাণী। হাতি প্রচন্ড শক্তির অধিকারী, দীর্ঘায়ু, পরিশ্রমী ও প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন। হ[illegible] রোগব্যাধিও খুব কম। শক্তিশালী প্রাণী হিসাবে, তেমনি গণ্ডার ও জিরাফের উদাহরণও দেওয়া যায়। এরাও নিরামিষাশী।

ফলমূল বা নিরামিষ খাদ্য পচে গেলেও, সেরকম সাংঘাতিক কোন বিষক্রিয়া হয় না। কিন্তু প্রাণীজ আমিষ খাদ্য পচনে তা সাংঘাতিক বিষাক্ত হয়ে যায়। সাঁওতালরা পচা মাংসের রস তীরের ফলায় লাগিয়ে শিকার করে। ঐ তীরের আঘাতে আহত প্রানীর পারে রক্ত দূষণে মারা যায়। মানুষের নাড়ী তার শরীরের চেয়ে তিনগুণ দীর্ঘ এই দীর্ঘপথ পরিভ্রমণ করতে আমিষখাদ্য টোমেন ও টকসিন বিষ উৎপন্ন করে যা কালক্রমে দেহের রোগ প্রতিরোধক শক্তি কমিয়ে দেয়। ফলে দেহে নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হয়। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ বলেন আমিষ ভোজীরা হাম, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড, রক্তআমাশয় রোগে সহজে কাবু হয়। সাত্ত্বিক নিরামিষাশীরা সহজে রোগাক্রান্ত হন না। বরং স্বাস্থ্য ও আয়ু আরো সমৃদ্ধ হয়। ক্লোরোফর্ম তত্ত্বে বিখ্যাত পন্ডিত ডাঃ লডার ব্রান্টান বলেছেন, আমিষভোজীদের ক্লোরফর্ম দেওয়া বিপজ্জনক।

Fedrid. J. Simson মন্তব্য করেছে- প্রাচীন গ্রীসের লেকেরা প্রাণী-হত্যা করলেও মাংস ভক্ষণ করত না। তারা বিশ্বাস করতো জন্তুর খাদ্য মানুষের সৎ- বিবেচনা শক্তি বা ধর্মবোধের অন্তরায়।

The New Health and Longevity (A.C. Solmon) গ্রন্থে নিরামিষ খাদ্যের সমর্থন আছে। লেখক লিখেছেন যে, ঈশ্বর যখন মানুষ সৃষ্টি করেন, তখন তাদের খাদ্যের জন্য ফলমূল, শস্যসমূহ ও শাকশব্জী সৃষ্টি করেছেন। ইংল্যান্ডের G. L. Rudd তার The Case of Vegetarianism নামক একটি গ্রন্থে লিখেছেন, আমিষভোজী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ক্যান্সার, টিবি, হৃদরোগ ও চর্মরোগের আধিক্য বেশী। সবরকম আহার্যের আদিম উৎস হচ্ছে উদ্ভিদ খনিজ লবন, ভিটামিন, প্রোটিন, ফ্যাট কার্বোহাইড্রেট ও সব রকম পুষ্টিকর উপকরণই এতে আছে। প্রাণীজ প্রোটিন শরীরে দূষিত রস Toxin জন্ম দেন। Toxin দেহকোষ বিভাজন দ্রুততর করে, মানুষকে ধীরে ধীরে পঙ্গু ও স্বল্পায়ু করে দেয়। স্নায়ুগুলি অনিয়ন্ত্রিত ও ছন্দহীন হয়ে যায়। সূক্ষ্ম শব্দগ্রহণের ক্ষমতা হারায়। আমিষ খাদ্য কোলেস্টরলের মাত্রা বাড়িয়ে হৃদ-রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। ক্লীবতা, ধর্ষণকামীতা স্থূলবুদ্ধি পরায়ণতা, অবিবেচক, দাম্ভিক মনোবৃত্তি গঠন করে। কিন্তু সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন নিরামিষ আহারের ফল মানুষের সমস্ত শুভবোধগুলি জাগ্রত হয়। তার মধ্যে দয়া মমতা মর্যাদা ও বাস্তববোধের প্রকাশ ঘটে। সে কখনও অসামাঞ্জস্য উত্তেজনার সৃষ্টি করে না। তার দূরদর্শীতাও বৃদ্ধি পায়।

আমাদের দেহে পাচক রসের মাধ্যমে পরিপাকক্রিয়া সংঘটিত হয়। কিন্তু আহাররূপে গ্রহীত মাছ মাংসের রস পাচক রসের সঙ্গে মিশে পাচক রসকে কিছুটা পরিমাণে বিষাক্ত করে তুলে। ফলে আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। ফরাসী দেশের বিখ্যাত প্রকৃতি ও শরীর তত্ত্ববিদ অধ্যাপক Baron Curier বলেছেন The natural food of man ludging from his structure, consists of fruits, roots and Vegetables.

W. A. Halliburton, M. D. F. R. C. P. তার Hand Book of Physiology গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, খাদ্যের মধ্যে ফলই সর্বশ্রেষ্ঠ। উদ্ভিদ খাদ্য রক্ত পরিস্কার করে,

খাদ্যের উপাদান ঃ তাপমূল্য ও ধাতব লবণ
(প্রতি ১০০ গ্রামে)

বিশেষ খাদ্যদ্রব্য	প্রোটিন	চর্বি	শর্করা	ক্যালসিয়াম	লৌহ	ফসফরাস	তাপমাত্রা (ক্যালরি)
চাল	৬.৪-৮.৫	.৪-৬	৭৮				৩৭৭
ভুট্টা-	১১.১	৩.৬	৬৬.২				৩৬৫
ছোলা	১৭.১	৫.৩.	৬১.২				৩৮৫
বরবটি	২৪.৬	.৭	৫৫.৭				৩৫২
মসুর	২৫.১	.৭	৫৯.৭				৩৭১
সয়াবিন	৪৩.২	১৯.৫	২০.৯		.০০৭০	.৪৭১	৪৫৩
দুধ	৩.৩-৩.৭	৩.৯-৫.৬	৪.৮	.১২০		.০৯৩	৬৭-৮৬
ছানা	২২.০	২.৪	.৩				১১৪
ঘি-মাখন	০-১	৮০-৯৯.২	----				৭৫৫-৯২২
বাদাম	২৬.৮	৫৮.৯	১০.৫-২০	.২৩৯	.০০৩৯	.৪৬৩	৬৫৫-৫৬৭
নারিকেল	৪.৫	৪১.৬	১৩.০				৪৫৪
পেস্তা	১৯.৮	৫৩.৫	১৬.২				৬৪২
মাংস	২৫.২	৩.৩	----				১৩৩
মাছ	১০-১৬.৬	১-১.৪	----				৬০.৮১
আলু	১-৬	.১	২২.৯				১০১
কলা	.৯৩-১	.২	১৪.৭-১৮				৬৬.৭০
গুড়	১.৪৬	.২৬	৮৬.০৭	.২১১			৩৬৪
পনির				.৯৪৫		.৬৮৩	

রোগব্যাধি দুর করে এবং ক্ষার উৎপন্ন করে রক্তের অম্লবিষ নষ্ট করে। উদ্ভিদ খাদ্য প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ ঔষধ। বিশেষজ্ঞদের মতে মানুষের শরীরের ওজন বাড়াবার আদর্শ টনিক হল, কাঁচা সব্জীর রস খাওয়া। The Moral Basis of Vegetarianism গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে মহাত্মা গান্ধী নিরামিষ খাদ্যের সপক্ষে এবং আমিষের বিপক্ষে আলোচনা করেছেন।

আমাদের শরীরের ক্ষয়পুরনের জন্য ছানাজাতীয় (নাইট্রোজেন) খাদ্য ১২৫ গ্রাম, শর্করা জাতীয় খাদ্য ৫০০ গ্রাম, স্নেহজাতীয় খাদ্য ১২৪ গ্রাম, লবণ জাতীয় খাদ্য ৬,২৫ গ্রাম, উদ্ভিজ খাদ্য থেকেই পাওয়া যায়। শুধু পুষ্টিকর খাদ্য খেলেই যে স্বাস্থ্য ভালো হয়, তা নয় সহজ পাচ্য, অনুত্তেজক ও ক্ষারধর্মী শ্রেয় খাদ্যই নির্বাচন করতে হবে, যা সহজে পরিপাক ও গ্রহণ করা যায়।প্রাণীজ আমিষ খাদ্য যে কোন খাবারের সঙ্গে খাওয়া যায় না, কিন্তু উদ্ভিজ প্রোটিন যে কোন খাবারের সঙ্গে খাওয়া যায়।

অনেকে তর্কচ্ছলে বলেন আমিষভোজীগণের মধ্যেও অনেক জ্ঞানী ও গুণী, স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘায়ু সম্পন্ন মানুষ ও রাষ্ট্রনায়কগণ আমিষ ও বিরুদ্ধ খাদ্য গ্রহণের ফলে হঠকারিতায় ভুগছেন ও বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। নিরামিষ ভোজীদের যে শরীর খারাপ হয় না, তা নয়। শরীর খারাপ হওয়া ব্যাপারটি আরো নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তাড়াহুড়া করা, ক্রোধ, দুঃচিন্তা, শোক দুঃখ বা ভয় ইত্যাদির মধ্যে খেলে হজমের ব্যাঘাত ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, ষড়রিপু সুনিয়ন্ত্রণে না থাকলে শুধু জল ও বায়ুভুক হলেও স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। শরীর সুস্থ রাখার জন্য খাদ্য নির্বাচন, পরিমাপ নিদ্ধারণ, পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিয়েও ভাবা প্রয়োজন ভগবৎ দর্শন' থেকে উদ্ধৃত।

পরিচ্ছন্নতা

ভগবত গীতার পরিচ্ছন্নতাকে দিব্যগুণ এবং ব্রাহ্মণের গুণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। একথা বলা হয়েছে যে, অপরিচ্ছন্নতা আসুরিকগুণ। চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তের ২৬ টি ঘুণের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণবদের জন্য পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বের উপর বারবার জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন তোমরা পরিচ্ছন্ন না হলে কৃষ্ণ লক্ষ মাইল দুরে রইবেন। পরিচ্ছন্নতা সাত্বিক, অপরিচ্ছন্ন তামসিক। আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সবসময় ঈশ্বরের পবিত্র নাম স্বরণ রাখতে হবে। 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' জপ করতে হবে। বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা বৈদিক সংস্কৃতিক অত্যন্ত ব্যাপক অংশ। শরীর, পোষাক, বাড়ী এবং বিশেষ করে মন্দির ও রান্নঘর পবিত্র ও পরিস্কার রাখতে হয়। বাইরে পরিস্কার থাকলে তা আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার জন্য সহায়ক হয়। শ্রীল প্রভু পাদ এ সম্পর্কে যে শিক্ষা দিয়েছেন তার কিছু বিষয় নীচে উল্লেখ করা হলো। যদি কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা এগুলো অনুসরণ করতে পারি তবে তা কৃষ্ণ ভাবনায় আমাদের অগ্রগতির সহায়ক হবে।

বিগ্রহ পূজার পরিচ্ছন্নতা।

সবকিছু অত্যন্ত পরিস্কার থাকা উচিৎ। রাত্রে শয়নের আগে ফুলগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। চিত্রপটসমূহ প্রত্যহ মুছা, বেদীরকাপড় নিয়মিত পাল্টানো এবং পিতলের সামগ্রী ঝকঝকে তকতকে রাখা কর্তব্য। গোটা বাড়ী সর্বোত্তমভাবে পরিচ্ছন্ন রাখা না গেলেও অন্ত তপক্ষে মন্দিরকক্ষকে অবশ্যই পবিত্র রাখা দরকার।

স্নান সেরে তিলক কেটে পরিস্কার পোশাকে ভক্তদের মন্দিরে আসতে হবে। আরতি অথবা প্রসাদ নিবেদনের আগে স্নান ও পরিস্কার কাপড় পরিধান অত্যাবশ্যক। কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই আমরা রান্না করি। তাই রান্না বিগ্রহ পূজার অঙ্গ। রান্নার আগেও স্নান করে তিলক কেটে পরিস্কার পোষাক পরিধান করতে হয়। স্নান করার পর যাতে কুকুর, বিড়াল, শিশু অথবা কোন অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তির ছোঁওয়া না লাগে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। রান্নার সময়ও এগুলোর ছোঁওয়া লাগলে পবিত্রতা নষ্ট হয়।

মাসিকের সময় মহিলারা বিগ্রহ পূজা অথবা কৃষ্ণের জন্য রান্নার কাজে নিয়োজিত হতে পারে না। শিশুরা সবসময় হাত পা মুখের মধ্যে দেয়, তাদের মুখ দিয়ে

লালা ঝরে এবং যে কোন সময় তারা মলমুত্র ত্যাগ করে বলে তাদেরকে অপরিচ্ছন্ন গণ্য করা হয়। তাই পূজা অথবা কৃষ্ণের জন্য রান্নার কাজে নিয়োজিত থাকাকালে শিশুস্পর্শ করা যায় না। (এ নিয়ম মন্দিরের জন্য, বাড়ীর জন্য নয়)।

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা

ব্রাহ্মণ ঘুম থেকে, দুপুরে এবং সন্ধ্যায় মিলিয়ে দিনে কমপক্ষে তিন বার স্নান করে থাকেন। স্নান শরীরকে ঠাণ্ডা, পবিত্র ও সতেজ করে। দিনে অন্ততঃ একবার ভালভাবে দাঁত প্রক্ষালন করা উচিৎ। নিয়মিত নখ কাটা ও পরিস্কার রাখা উচিৎ। পোষাক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। প্রতিদিন নতুনভাবে ধোয়া পরিস্কার জামাকাপড় পড়া বিধেয়। জলও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিৎ।

মহাপ্রভু অনুসারীরা লম্বা চুল রাখা অপছন্দ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পুরুষেরা শিখা রাখেন, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তার শিষ্যদের বড় শিখা রাখতে নিষেদ করতেন, কারণ শাস্ত্রমতে ১/২ ইঞ্চির বেশী বড় শিখা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিধান নয়। অন্য সম্প্রদায়ের।

গৃহস্থলী পরিচ্ছন্নতার মধ্যে রয়েছে নিয়মিত ধুলা ও মাকড়সার জাল পরিস্কার করা ও সবকিছু সাজানো গোছানো রাখা, অপবিত্র সামগ্রী (জুতা, মাংস, তামাক, মদ ইত্যাদি) দূরে রাখা। বৈদিক সংস্কৃতি কুকুর ও বিড়ালের উপকারিতা স্বীকার করে। তবে তারা মাংস খায়, নিজেদের শরীর লেহন করে এবং গায়ে কটুগন্ধ আছে বিদায় এদেরকে অপবিত্র গণ্য করা হয়। বৈদিক সংস্কৃতি কুকুর বিড়ালকে ভালভাবে পালনের কথা বলে। তবে এগুলো ঘরের বাইরে রাখা উচিৎ।

একাদশী ব্রত পালন

ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে যে, একাদশীর দিন উপবাস করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে আন্তরিক পুণ্য লাভ করা যায়। একাদশীর দিন উপবাস করাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে গোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা এবং প্রেমভক্তি পরায়ণ হওয়া। একাদশীর দিন উপবাস করার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শারীরিক আবশ্যকতা গুলো খর্বকারে ভগবানের মহিমাকীর্তন এবং অন্যভাবে ভগবানের সেবা করে সময়ের সদ্ব্যবহার করা। উপবাসের দিন নিরন্তর গোবিন্দের লীলাস্মরণ এবং তাঁর দিব্য নাম শ্রবণ করাই হচ্ছে সর্বোত্তম। পুরোপুরি উপবাস থেকে অথবা শুধু জল কিংবা সরবত খেয়ে অথবা শস্য কিংবা সীম ছাড়া অন্য খাদ্য গ্রহণ করে একাদশী ব্রত পালন করা হয়। শষ্য ডাল ও সীম জাতীয় খাদ্য নিবেদন করলেও একাদশীতে তা আহার করা নিষিদ্ধ। একাদশীতে যে সমস্ত খাদ্য নিষিদ্ধ সেগুলো হচ্ছে সবরকমের শস্য ও সীম জাতীয় খাদ্য যেমন ঃ ভাত, মুড়ি, ময়দা, আটা, ডাল, বরবটি, মটরশুটি, বুট ইত্যাদি। যে সমস্ত খাদ্য গ্রহণ করা যায় সেগুলো হচ্ছে ফল, সব্জী, (সীম ও মটরশুটি ছাড়া) বাদাম সাগু, দুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পঞ্জিকায় আরও কয়েকটি উপবাসের দিন রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জন্মষ্টমী (মধ্যরাত্রি পর্যন্ত উপবাস), গৌরপূর্ণিমা (চন্দোদয় পর্যন্ত উপবাস) নিত্যানন্দ এয়োদশী, নৃসিংহ চতুর্দশী, শ্রীশ্রী রামনবমী ইত্যাদি।

বৈষ্ণবের সাধারণ ব্যবহার

কৃষ্ণভাবনামৃত সম্পূর্ণরূপে ত্রিগুনাতীত। পার্থিব বস্তু জগতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব দেহত্যাগের পর সরাসরি আধ্যাত্মিক জগতে চলে যান। কিন্তু মুক্ত ও নবীন নির্বিশেষে সকল বৈষ্ণবকেই এই পার্থিব জগতেবসবাস করতে হয়। যদিও ভক্তির প্রশ্নে বৈষ্ণব কখনও আপোষ করে না তবুও শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপনের স্বার্থে সাধারণ আচরণের ব্যাপারে তাঁর উদাসীন থাকা উচিৎ নয়।

বিশেষতঃ অধিকাংশ ভক্ত গার্হস্থ আশ্রমে অবস্থান করেন। তাদের অনেক পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। বৈষ্ণব হতে হলে অবশ্যই সন্ন্যাসী হতে হবে এ ধারনা ভুল। গ্রহস্থ থেকেও যে কোন ব্যক্তি কৃষ্ণসেবা করতে পারেন। যেমন ভক্তিবিনোদন ঠাকুর বলেনঃ "গৃহে থাক বনে থাক সদা হরি বলে ডাক"।

অবশ্য একথা ভাবা ঠিক নয় যে কেবল সন্ন্যাসীদেরকেই কঠোর নীতি পালন করতে হবে। গৃহস্থদেরকেও অবশ্যই নিস্পাপ জীবন যাপন করতে হবে। অথাৎ কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ, আমিষ বর্জন, ইন্দ্রিয় দমন, ইত্যাদি। সমাজে স্বাভাবিক কারণেই শ্রম বিভাগ রয়েছে। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সৈনিক, কৃষক, ব্যবসায়ী শ্রমিক, কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ার, ইত্যাদি

সকলের প্রয়োজন সমাজে আছে। যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, যে কেউ কৃষ্ণ সেবা করতে পারে।

"কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী।
কৃষ্ণ ভজনে হয় সবই অধিকারী ॥"

একজন বৈষ্ণব সৎপথে থেকে তার জীবন যাত্রার ব্যয় নির্বাহ করে এবং কারও উপর বোঝা হয়ে থাকে না। সে একজন আদর্শ নাগরিক খাঁটি সাদাসিদা এবং ধর্মপ্রাণও বটে। পেশার ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব সর্বদা পাপাচার থেকে দূরে থাকে। উদাহরণ স্বরুপ সে কোন অবস্থাতেই কসাই এর কাজ নেবে না।

কোন কোন ক্ষেত্রে দুষ্কর্মের জন্য সৃষ্ট দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতে কোন কোন লোক অত্যান্ত খারাপ অবস্থায় জন্মগ্রহন করে এবং তারা পাপাচার করতে বাধ্য হয়। উদাহরণ স্বরুপ আমারা দেখি যে মৎসজীবী সম্প্রদায়ের লোকজন প্রায়ই হরিনাম কীর্তনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তারা প্রায় সকলেই অত্যন্ত গরীব এবং মাছ ধরার মত হীন কাজ করে দিনান্তে কোন মতে বেঁচে থাকে। তারা খাঁটি বৈষ্ণব হবার ব্যাপারে প্রকৃতই আগ্রহী হলে আমরা বলব যদি সম্ভব হয় তবে তাদের এ পেশা ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। যদি তা একেবারেই সম্ভব না হয় তাহলেও তাদের নিরাশ হয়ে হরিনাম কীর্তনের প্রক্রিয়া বন্ধ করা উচিৎ হবে না। বরং নিজেদেরকে অত্যন্ত পতিত ও অভাগা ভেবে তারা অন্তরের গভীর থেকে আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ অবশ্যই তাদের প্রতি কৃপা করবেন।

অনেকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এর সব নিয়ম কানুন মেনে চলা তারা কঠিন মনে করে। তবে এরা ধীরে ধীরে এসব নিয়ম কানুন মেনে চলার অভ্যাস করতে পারে।

উদাহরণ স্বরুপ- কোন ব্যাক্তি সপ্তাহে ৭ দিন আমিষ খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত। তার উচিৎ হবে সপ্তাহে প্রথমে ৬ দিন, পরে ৫ দিন এভাবে আমিষ খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে আনা, যে পর্যন্ত তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। অবশ্য মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে একেবারে চিরদিনের জন্য আমিষ খাদ্য বর্জন করা সব চেয়ে ভাল। কারণ মাসে একবার আমিষ খাদ্য গ্রহণ করলেও তা কৃষ্ণ ভাবনার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

গো রক্ষা

বৈদিক শাস্ত্র মতে গোরক্ষা সার্বিক ভাবে মঙ্গল বয়ে আনে এবং গো হত্যা অমঙ্গল বয়ে আনে। যদি কারও একটি গরু থাকে তবে সে খাঁটি দুধ খেতে পারে। আর এই খাঁটি দুধ আধ্যাত্মিক বিষয়াদি অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় মস্তিস্কের কোষ সমূহকে পুষ্ট করে।

অবশ্যই কারো কাছে একটি গরু থাকলে সেটার স্বাভাবিক মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব ঐ ব্যাক্তির উপর বর্তায়। এমনকি গরুর বয়স বেড়ে গেলে এবং সে দুধ দিতে না পারলেও আমাদের উচিৎ নয় তাকে বিক্রি করে দেয়া। যদি আমরা গরু বিক্রি করে দেই এবং তাকে যদি হত্যা করা হয় তবে আমারও গো হত্যার দায়ভাগি হবো।

ষাঁড় বলদের বেলাও একই কথা প্রযোজ্য। আমাদের অবশ্যই তাদেরকেও রক্ষা করতে হবে। যদি আমাদের গাভী একটি ষাঁড়ের জন্ম দেয় তবে তার নিরাপত্তার বিধানের দায়িত্বও আমাদের। অন্যথায় কর্মের বিধান অনুযায়ী আমাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

স্ত্রী সঙ্গ

"নারী আগুন এবং পুরুষ ঘৃতপাত্রের সাথে তুলনীয়। তাই কোন পুরুষের নির্জন স্থানে এমনকি তার কন্যার সংসর্গও এড়িয়ে চলা উচিৎ। একইভাবে অন্যান্য নারীর সাথে মেলামেশাও তার এড়িয়ে চলা উচিৎ। অন্যকোন কারণে নয়, কেবল মাত্র জরুরী প্রয়োজনেই পুরুষের উচিৎ নারীর সাথে মেলামেশা করা। (শ্রীমদ্ভগবত ৭/১২/৯) শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যা :- 'যদি একটি ঘিয়ের বাটি এবং আগুন একত্রে রাখা হয় তবে মাটির মধ্যকার ঘি অবশ্যই গলে যাবে। নারীকে আগুনের সাথে এবং পুরুষকে ঘিয়ের বাটির সাথে তুলনা করা হয়। কোন পুরুষ ইন্দ্রিয় সংযমের ক্ষেত্রে যতদূরই অগ্রসর হোক না কোন একজন নারীর সামেনে নিজেকে সংযম রাখা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। সে নারী নিজের মেয়ে, মা অথবা বোন হলেও একই কথা প্রযোজ্য। সন্ন্যাস গ্রহণকারী ব্যাক্তিও সময়বিশেষে উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারেন। তাই বৈদিক সভ্যতা সতর্কতার সাথে পুরুষ ও নারীর মেলামেশার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। যদি কেউ নারী ও পুরুষের মেলামেলা সীমিত রাখার মৌলিক নীতি অনুধাবনে ব্যর্থ হয় তবে সে পশুর সাথে তুলনীয়। এটাই এ শ্লোকের তাৎপর্য।'

"জড় জগতের অস্তিত্বের মূলনীতি হচ্ছে পুরুষ ও নারীর মধ্যেকার আকর্ষণ। এই ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হয়ে পুরুষ ও নারীর হৃদয় পরস্পরের কাছাকাছি আসে এবং একে অপরের শরীর, বাড়ী, সম্পত্তি, সন্তান, আত্মীয় ও সম্পদের প্রতি "আকর্ষণ অনুভব করে। এভাবে মানুষের জীবনে মায়ার বন্ধন বাড়তে থাকে এবং মানুষ চিন্তা করে 'অহং মমেতি' আমি এবং আমার।" (শ্রীমদ্ভগত-৫/৫/৮)।

বৈদিক সংস্কৃতিতে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী এবং সন্ন্যাসীদের বেলায় নারীর সাথে ব্যাপক মেলামেশা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধুমাত্র গৃহস্থদেরকে নারীর সাথে মেলামেশার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে তাদের বেলাতেও বিধিনিষেধ আছে। নারীর প্রতি আনাসক্ত হওয়া ছাড়া আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রগতি অসম্ভব।

গৃহস্থদের জন্য অবশ্য যৌনজীবন অনুমোদিত। তবে তা কেমল মাত্র সন্তান জন্মদেয়ার জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী গুরুর নিকট থেকে আজ্ঞা লাভের পর গৃহস্থ যৌনজীবন যাপন করে। নারীর মাসিক হবার পর স্বামী স্ত্রী মিলিত হবার উপযুক্ত সময়। স্বামী স্ত্রী গর্ভাধানসংস্কার পালন করে পরস্পর মিলিত হয়ে থাকে। গর্ভাধান সংস্কার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মিলিত হবার আগে দম্পতির মনে পবিত্রতার সঞ্চয় ঘটে। মিলিত হবার সময় দম্পতির মানসিক অবস্থা অনুসারে বিশেষ ধরণের জীব গর্ভে আকৃষ্ট হয়। পশুদের যৌনমিলন শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তির লক্ষ্যে পরিচালিত। মানুষও যদি একই ধারা অনুসরণ করে তবে কোন ধরণের সন্তান জন্ম নিতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তাই যৌন জীবনে মিলিত হবার আগে পিতামাতাকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হয়।

গর্ভাধান সংস্কার অত্যন্ত জটিল বৈদিক প্রক্রিয়া। তাই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর বিবাহিত শিষ্যদের জন্য এই বিকল্প ব্যবস্থা করেছেন যে মিলনে রত হবার আগে তারা মনকে পবিত্র করার জন্য ৫০ মালা (৫০ X ১০৮) হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করবে। নারী গর্ভবতী থাকলে অথবা সন্তান জন্মদেয়ার ৬ মাস পর পর্যন্ত সময়ে অথবা জন্মনিরোধক ব্যবহার করে যৌন মিলন উচিৎ নয়। বিবাহিত জীবনেও এ সমস্ত সীমা লংঘন করলে তা অবৈধ যৌনাচার হিসাবে গণ্য হয় এবং তা কৃষ্ণ ভাবনার নীতিবিরুদ্ধ।

বৈষ্ণবের ভাব এবং প্রবৃত্তি

এটা সকলেই জানেন যে, বৈষ্ণবরা চরিত্রগতভাবে অত্যন্ত বিনয়ী। অবশ্য এই নম্রতার প্রকৃতি কেমন তা দেখতে হবে। একজন বৈষ্ণব সব সময় নিজেকে পতিত এবং শিক্ষানবিস বলে মনে করে থাকেন। যেমনঃ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ-

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পূর্ণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥

তাই একজন বৈষ্ণব নিজেকে একজন প্রকৃত গুরুর তত্ত্বাবধানের রাখতে চান। তাঁর আধ্যাত্মিক অগ্রগতির স্বার্থে তিনি সর্বদা তাঁর গুরু এবং প্রবীন ভক্তদের কাছে থেকে নির্দেশ ও তিরস্কার গ্রহণে প্রস্তুত থাকেন। একজন শিশু যে ভাবে তার পিতামাতার স্নেহ, শাসন ও নির্দেশের মধ্যে বড় হয়ে উঠে একজন বৈষ্ণবও গুরুর কাছে সেভাবে থাকতে চান।

মাত্র বিনয়ের বাহ্যিক প্রদর্শনী করে জনগণের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করা যায়। কিন্তু এর দ্বারা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা যায় না। প্রকৃত বৈষ্ণব কখনও নিজে কতটা বিনয়ী তা অপরকে দেখাতে আগ্রহী থাকেন না। বরং তিনি বিশেষভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁর গুরুর নির্দেশ পালনে নিষ্ঠাবান থাকেন।

একজন প্রকৃত বৈষ্ণব আচরণের দিক থেকে সাধারণতঃ ভদ্র, বিনয়ী ও ধীরস্থির হয়ে থাকেন। কখনও কোন কোন ভক্ত কৃষ্ণের প্রতি পুরোপুরি আত্মসমর্পন করা প্রচার করেন। অন্য সবকিছুকে তাঁরা কঠোরভাবে সমালোচনা করে থাকেন, কিন্তু এটা গোঁড়ামী অথবা সঙ্কীর্ণতা নয়। বরং এই উপলব্ধি থেকে একথা বলা হয় যে, কৃষ্ণ ভাবনামৃত ছাড়া প্রত্যেককে অবশ্যই জন্ম ও মৃত্যুর ভয়াবহ চক্রে অব্যাহতভাবে আবর্তিত হতে হবে। বদ্ধ জীবাত্মার প্রতি সর্বোচ্চ করুণা প্রদর্শনের লক্ষ্যেই প্রকৃতপক্ষে এধরনের কঠোর ও সরাসরি বক্তব্য দেয়া হয়। অবশ্য ভুল বুঝে সাধারণ মানুষ মনে করতে পারে যে, এই ভক্ত অত্যন্ত অহংকারী এবং একগুঁয়ে। কিন্তু তিনি কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর গুরুর নির্দেশ পুংখানুপুংখ রূপে পালন করছেন মাত্র। একজন ভক্তি প্রচারক কখনও নিজেকে বিরাট সাধু মনে করেন না। তিনে নিজেকে গুরুর বিনীত সেবক রূপেই দেখেন।

তাই আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যান। এটাই যথার্থ নম্রতা। অবশ্যই পরম সৌভাগ্যগুণে যে ব্যক্তি কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবদের কৃপালাভ করেছেন এবং কৃষ্ণভক্তির পথ বেছে নিয়েছেন, তিনি সাধারণ মানুষের তুলনায় আধ্যাত্মিক জগতে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। একথা বিবেচনা করে একজন শিক্ষানবিস ভক্তসাধারণ মানুষকে মায়াবদ্ধ জীব ভেবে নিজের সম্পর্কে গর্ব বোধ করতে পারেন। এধরনের ভক্তের মনে রাখা উচিৎ যে, প্রথমতঃ সেও সাধারণ মানুষের মত একই পথে চলছিল। কেমলমাত্র গুরুর কৃষ্ণের কৃপায় সে রক্ষা পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তার বুঝা উচিৎ যে, সে অত্যন্ত নবীন ভক্ত। তার হৃদয়ে এখনও অনেক মলিনতা রয়েছে। তার গুরু, রূপ গোস্বামী প্রভৃতি প্রকৃত ভক্তের তুলনায় সে আসলে কিছুই নয়। যদি একজন ভক্ত সুন্দরভাবে ভজন করতে এবং সফলভাবে প্রচার করতে পারে তবে তার মনে করা উচিৎ যে, এটা গুরুর আশীর্বাদ। এতে অহংকার করার কিছুই নাই। কারও মনে অহংকার জাগ্রত হলে সে কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুশীলনে যথার্থ অগ্রগতি অর্জন করতে পারে না। সুন্দর সাধনযুক্ত এবং বাহ্যিক বিনয়প্রদর্শন সত্ত্বেও আত্মগর্ব তার নিজের জন্য এবং সে যাদের সাতে মেলামেশা করে তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি কোন ভক্ত মনের এভাব দমন করতে না পারে তবে তারমধ্যে নম্রতা আনার জন্য এমনকি কৃষ্ণ তাকে ভক্তির কঠোর নীতিমালা সমূহ থেকে বিচ্যুত করতেও পারেন।

একইভাবে প্রত্যেক ভক্তের সতর্ক থাকা উচিৎ, যেন তাদের মনে বিখ্যাত বক্তা, কীর্তনিয়া ইত্যাদি হওয়ার মোহ না জাগে।

একজন ভক্ত ভাল বক্তা হতে পারেন। কিন্তু নিজের জন্য নয়, কৃষ্ণের মহিমা তুলে ধরবার কথাই সব সময় তার মনে রাখতে হবে। একজন আত্মসর্বস্ব প্রচারক আসলে কখনই অপরের কল্যাণ করতে পারে না।

কৃষ্ণভাবনার অগ্রগতি সর্ম্পকে রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দেয়ার সময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিমার্গের প্রতিবন্ধকতাসমূহের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি বিশেষভাবে নিষিদ্ধচার, কূটনীতি, জীব হিংসা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি সম্পর্কে হুশিয়ার থাকতে বলেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আরও বিশদভাবে জানতে আগ্রহী হলে পাঠকগণ শ্রীল এ সি ভক্তিবেদান্তস্বামী প্রভুপাদ প্রণীত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রন্থমালা পড়তে পারেন।

ধর্মাড়ম্বর

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত)

অনেকে বাহিরে ধর্মভাব দেখাইবার জন্য অতিশয় যত্ন করিয়া থাকেন। লোকে ভক্ত বলিবে, ধার্মিক বলিবে, এই ইচ্ছাই প্রবল। ভিতরে একটু মাত্র ধর্মভাব নাই, সত্য করিয়া কখন ভগবানকে ভাবেন নাই, কিন্তু বাহিরে পরম ধার্মিক বলিয়া পরিচয় দেন। এইরুপ বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ করিয়া কত লোক যে কী ভীষণ কার্য্য করিতছে তাহার উয়ত্তা নাই। কিন্তু উহা যে কি গুরুতর অপরাধ, ভগবচ্চরণ হইতে যে কতদূরে পড়িতে হয়,তাহা মনে একবার স্থান পায় না। একটি গীত আছে, ভগবান বলিতেছেন,-

"অহঙ্কারী পাপী যারা,-
আমার দেখা পায় না তারা,
দীনজনের বন্ধু আমি সকলে জানে"।

তবে আমাদের অহঙ্কার কিসের? যদি যথার্থই ভগবাচ্চরণ লাভ করাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কপটতা করিয়া বাহির ধর্মভাব দেখাইলে কি উদ্দেশ্য সফল হইবে? লোকে নাইবা ভক্ত বলিবে, নাইবা ধার্মিক বলিবে, তাহাতে আমাদের কি আসিয়া যায়? শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন,-

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি ঃ॥"

যদি যথার্থ ভগবচ্চরণ পাইতে- যদি সে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, হে মানব! তাহা হইলে নীচ অতি নীচ হও, হইয়া শুদ্ধচিত্তে শ্রী নাম কীর্ত্তন কর, প্রেম আপনি উদয় হইবে। কীর্ত্তন কর- কেহ যেন না মনে করেন যে, কেবল উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন। কীর্ত্তন অনেক প্রকার আছে। বৈষ্ণব বলেন-

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

সাধনের দ্বারা যে সাধ্যবস্তু লাভ হয় তাহা অনিত্য , এতএব কৃষ্ণদাস্যরুপ বিমলপ্রেম সাধ্যবস্তু নয় আপনি উদয় হয়। সূর্য্য নিত্যসিদ্ধ, কিন্তু বারিদসমূহে আবৃত করিয়া রাখিলে যেমন সূর্য্যকে দর্শন করা যায় না, কৃষ্ণদাস্যরুপ বিমল প্রেমও সেইরুপ আমাদের হৃদয়ে মায়ারুপ মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন। বারিদসমূহ চলিয়া গেলে সূর্য্যের যেমন প্রকাশ হয়, কৃষ্ণদাস্যরুপ বিমলপ্রেম সেইরুপ। শুদ্ধচিত্তে শ্রীনাম কীর্ত্তনাদি করিলে হৃদয় যখন নির্মল হইবে অর্থ্যাৎ মায়ারুপ মেঘসমূহ যখন হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইবে, তখন সেই সূর্যরুপ বিমলপ্রেম আপনি উদয় হইবে, নতুবা বাহিরে ধর্মভাব দেখাইলে বিমল আনন্দ উপভোগ হইবে না।

ভক্তগণ! আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা নিরপরাধী হইয়া শুদ্ধচিত্তে শ্রীনাম-কীর্ত্তনাদি করিতে পারি।

গুরু গ্রহণ ও ত্যাগ

মাত্র বই পড়ে জীবনের পূর্ণতা অর্জন করা যায় না। আধ্যাত্মিক জীবনে ব্যক্তিগত পথ নির্দেশের জন্য শাস্ত্র জোর দিয়েছে যে, প্রত্যেকের অবশ্যই একজন গুরু গ্রহন করা প্রয়োজন। তাই আমরা দেখতে পাই হিন্দু সমাজে প্রায় সব লোকের অন্তত একজন গুরু আছে।

অবশ্য প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন অত্যন্ত গভীর ব্যাপার। জন্ম, জন্মান্তরে যে মায়ার বন্ধনে আমরা আবদ্ধ এটা তার থেকে মুক্তি লাভের বিষয় বটে। শুধু মাত্র আমি একজন হিন্দু' 'আমি একজন মুসলিম' 'আমি একজন গুরু' 'আমি একজন ভক্ত' ইত্যাদি কথা বার্তা বললে কেউ প্রকৃত ধর্মপরায়ন ব্যক্তি হয় না।

এতএব যে প্রকৃতই জীবনের মূল লক্ষ্য অথ্যাৎ শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে চায় তাকে অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রশিক্ষণ ও পথনির্দেশ দিতে সক্ষম একজন খাঁটি কৃষ্ণভক্ত খুঁজে বের করতে হবে। হরিভক্তি বিলাসে উল্লেখ আছে যে একজন উৎসাহী শিষ্যের উচিৎ একজন আচার্যের কাছেকমপক্ষে একবছর হরিকথা শ্রবণ করা। এরপর গুরু যদি সন্তুষ্ট হন যে শিষ্য এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং গুরুদেব যদি সম্প্রদায় অনুমোদিত হন তবে দীক্ষা হতে পারে। দীক্ষার সময় শিষ্যকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে আর জীবনভর সে ৪ টি নীতি আবশ্যিকভাবে মেনে চলবে এবং প্রতিদিন ১৬ মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করবে। এই চারটি বাধ্যতামূলক নীতিমালা হচ্ছে (১) অবৈধ নারী সঙ্গ ত্যাগ (বিবাহি জীবনেও যৌন সম্পর্ক শুধু মাত্র সন্তান জন্মানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে) (২) আমিষাহার সম্পূর্ণ বর্জন, (৩) সবধরণের জুয়া খেলা বর্জন (৪)চা, কফি, পান, তামাকসহ সবধরণের নেশা বর্জন।

সদগুরু গ্রহণের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিৎ। তাঁকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত সমুদয় নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। তিনি অবশ্যই উপরে বর্ণিত ৪ নীতিমালা ব্যক্তিগতভাবে অনুসরন করবেন এবং সেগুলো অনুকরণ করতে তাঁর শিষ্যদের অবশ্যই শিক্ষা দেবেন। তিনি নিজে তাঁর গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিদিন কমপক্ষে ১৬ মালা জপ করবেন এবং তাঁর শিষ্য যাতে তা করে সে ব্যাপারে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখবেন। সদগুরু কখনও মনগড়া 'মন্ত্র' দেবেন না, কাল্পনিক 'অবতারের' কথা বলবেন না এবং লাভ, পুজা অথবা প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করবেন না। তাঁকে অবশ্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বীকৃত সম্প্রদায়ভুক্ত হতে হবে।

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেনঃ

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যে কৃষ্ণতত্ত্ব বেত্তা সেই গুরু হয়॥ (চৈঃ চঃ,৮/১২৭)

আর তাঁর 'প্রেমবিবর্ত' নামক গ্রন্থ জগদানন্দ পন্ডিত লিখলেন ঃ

কিবা বর্ণ, কিঁবা শ্রমী, কিবা বর্ণনাশ্রমহীন।
কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যেই, সেই আচার্য প্রবীণ॥

কৃষ্ণ কৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

(আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য)

যিনি শ্রী মন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের ভবিষ্যৎ বাণীর স্বার্থক রূপায়ন ঘটিয়েছেণ সারা বিশ্বে হরি নাম প্রচারের মাধ্যমে

আসল কথা ছাড়ি ভাই, বর্ণে যে করে আদর।
অসদগুরু করি তা'র বিনষ্ট পূর্বাপর॥

জাতের কোন বাধা নেই। যে কোন অবস্থায় থেকে যে কেউ গুরু হতে পারেন। তবে তাঁকে কৃষ্ণের অকৃত্রিম ভক্ত হতে হবে। এটাই প্রধান যোগ্যতা। এ ছাড়া যদি কেউ সদগুরু নয় এমন কোন লোকের কাছে থেকে অতীতে দীক্ষা নিয়ে থাকেন তাবে তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে সেই লোককে প্রত্যাখ্যান করে একজন সদগুরু গ্রহণ করা। এটা শাস্ত্রের নির্দেশ। একজনকে গুরু রুপে গ্রহণ করার পর তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। একথা সত্য নয়। একজন প্রতারক যদি আমাদের ভুল পথে নামিয়ে নিঢে যেতে চায় তবে অবশ্যই তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। বলি মহারাজ শুক্রাচার্য্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সে দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে আছে।

শুক্রচার্য বলি মহারাজের কুল গুরু ছিলেন। কিন্তু যখন ভগবান বিষ্ণু বামন অবতারে বলিকে ছলনা করতে দান গ্রহনের জন্য এসেছিলেন তখন শুক্রচার্য্য সেই ব্রাহ্মনরুপী বিষ্ণুর সেবা করতে নিষেদ করিছিলেন। মহারাজের ধারণা হল জীবনের পরম উদ্দেশ্য বিষ্ণু সেবা। এতএব আমার গুরু যদি সেই পরম পুরুষ ভগবানকেই ত্যাগ করতে বলেন তা হলে আমি অবশ্যই তার চেযে আমার গুরুকে বর্জন করব। কারণ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্যই গুরু গ্রহণ প্রয়োজন।

তাই শুক্রাচার্যকে ত্যাগ করায় বলি মহারাজের কোন ক্ষতি হয় নাই। বরং তিনি ভগবানের পরম পদ পেয়েছিলেন। এ প্রসংগে শ্রীল প্রভুপাদ কৃত শ্রীমদ ভাগবতের (৮-১০-১) শ্লোক ও তাৎপর্য্য প্রামাণ্য যুক্তিরূপে উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

শ্রীশুক উবাচ

বলি রেবং গৃহপতিঃ কুলাচার্যেণ ভাষিত ঃ।
তুষ্ণিং ভূত্বা ক্ষনং রাজনুবাচবহিতো গুরুম ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন, "হে মহারাজ পরীক্ষিৎঃ যখন বলি মহারাজ তার কুল গুরু শুক্রাচার্য্য কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন, তখন কিছুক্ষণের জন্য তিনি নীরব রইলেন। তারপর সম্পূর্ণ বিবেচনা করে তার গুরুদেবকে উত্তর প্রদান করলেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয় সিদ্ধান্ত করেছেন যে বলি মহারাজ এই সংকটাপন্ন অবসথায় নীরবতা পালন করলেন। কি করে তিনি তার গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের আদেশ অমান্য করবেন? বলিমহারাজের মৃত সুধীর ব্যক্তির কর্তব্য হল তার গুরুর আদেশ যথাযথ বাবে তৎক্ষণাৎ পালন করা যা তিনি নির্দেশ করেছেন। কিন্তু বলিমহারাজ ভাবলেন যে আর এই শুক্রাচার্যকে গুরু হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। কারণ তিনি গুরুর কর্তব্য লঙঘন করেছেন।

শাস্ত্র মতে গুরুর দায়িত্ব হল শিষ্যকে ভগবদ্ধামে নিয়ে যাওয়া। তা যদি তিনি না পারেন তাহলে তার গুরু হওয়া উচিৎ নয়। গুরুর্ন স স্যাৎ (ভাঃ ৫, ৫, ১৮)। কারও গুরু হওয়া ঠিক নয় যদি তিনি তাঁর শিষ্যকে কৃষ্ণ ভাবনার শক্তি প্রদান করতে না পারেন। জীবনের পরম উদ্দেশ্য হল ভগবান কৃষ্ণের ভক্ত হওয়া যাতে ভব বন্ধন ঘুচে যায়। কৃষ্ণ ভাবনায়

উন্নয়নের মাধ্যমে এই স্তরে উত্তীর্ণ হতে গুরুদেব সাহায্য করেন। কিন্তু শুক্রাচার্য নির্দেশ দিচ্ছেন বলি মহারাজকে যাতে তিনি বামন দেবের প্রতি তার প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন। অতএব বলি মহারাজ ভাবলেন, এই অবস্থায় তার গুরুর আদেশ অমান্য করলে কোন দোষ নেই। এ প্রেক্ষাপটে তিনি বিবেচনা করলেন, তার গুরুর আদেশ রক্ষা করাই উচিৎ না স্বাধীন ভাবে ভগবানকে খুশী করা উচিৎ? তিনি কিছু সময় কাটালেন। এ বিষয় সুবিবেচনার পর তিনি স্থির করলেন, যেকোন অবস্থায় ভগবান বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করাই বিধেয়, এমন কি গুরুদেবের এই বিতর্কিত আদেশ অমান্য করার ঝুঁকি নিয়েও।

গুরু হতে প্রস্তাবিত অথচ বিষ্ণুভক্তি বিধি বিরোধী, তিনি গুরু হিসাবে গ্রহণ যোগ্য নন।

ভ্রান্তি বশত ঃ যদি কেহ এ ধরণের গুরু গ্রহণ করেন তা হলে পরিত্যাগ করা উচিৎ।

মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে (১৭ নং -২৫) এই ভাবে এ ধরণের গুরু সম্পর্কে বর্ণনা আছে ঃ- গুরুরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্যম জানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পারত্যাগো বিধীয়তে॥

-(ভোগ বিষয় লিপ্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং ভক্তি ব্যতীত ইতর পন্থানুগামী ব্যক্তি গুরু হলেও পরিত্যাজ্য)

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদের উপদেশ, এ ধরনের অপদার্থ তথাকথিত গুরু, পারিবারিক পরোহিত যিনি গুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ-অবশ্যই পরিত্যাজ্য এবং যথার্থ সদগুরু গ্রহণযোগ্য।

ষট কর্ম্ম নিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্র বিশারদ ঃ অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণব ঃ শ্বপচো গরু ঃ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহঃ এই ষট কর্মনিপুণ এবং মন্ত্র তন্ত্র বিশারদ অবৈষ্ণব ব্রাম্হণও গুরু হতে পারেন না; কিন্তু চন্ডাল কুলে প্রকটিত হলেও বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণ বৈষ্ণব গুরু হবারযোগ্য। নারদ পঞ্চরাত্রে আরো উল্লেখ যে তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষায়ম'।

"যিনি (আচার্য্য বেশে) অন্যায় অর্থাৎ শাস্ত্র বিরোধী কথা বলে এবং যারা শ্রবণ করেন তাহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, যদি কোন তথাকথিত গুরু তাঁর ব্যক্তিগত সুবিধা অথবা বস্তুগত লাভের জন্য শিষ্য গ্রহণ করেন তবে গুরু ও শিষ্যের মধ্যকার সম্পর্ক জড় বিষয়ক হয়ে পড়ে এবং গুরু ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন হয়ে যান। অনেক গোস্বামী আছেন যারা পেশাদারী মনোভাব নিয়ে শিষ্য সৃষ্টি করেন। এরা শিষ্যদের প্রতি যত্নবান হন না এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় যথাযথ নির্দেশও দেন না। এ ধরণের গুরুরা তাদের শিষ্যদের কাছ থেকে শুধুমাত্র বৈষয়িক সুবিধা আদায় করতে পেরেই খুশী হন। এ ধরণের সম্পর্ক নিন্দনীয়। এই সব গুরু ও শিষ্য প্রতারক ও প্রতারিতদের একটি গোষ্ঠী ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদেরকে বাউল অথবা প্রকৃত-সহজিয়া ও বলা হয়। গুরু এবং শিষ্যের মধ্যকার যোগাযোগ কে সস্তা করে ফেলাই তাদের উদ্দেশ্য। আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে উপলব্ধি অর্জনের ব্যাপারে তারা মোটেই আন্তরিকভাবে আগ্রহী নয়।

দীক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়া নিম্নরূপ ঃ

১। শিক্ষাঃগুরু শিষ্যকে কৃষ্ণভাবনামৃত সম্পর্কে নির্দেশ দেন। শিষ্য তখন নীতিমালা সমূহ অনুসরণ এবং মালা জপ করতে শুরু করে।

২। পরীক্ষাঃ গুরু অব্যাহতভাবে নির্দেশ দেন এবং শিষ্য সবকটি নীতিমালা মেনে চলছে কিনা তা নিয়মিত পরীক্ষা করেন।

৩। দীক্ষা ঃ যদি একবছর নিষ্ঠার সাথে বিধিমাল অনুসরণের পর গুরু শিষ্য সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন এবং শিষ্য গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত হয় তবে দীক্ষা হতে পারে।

৪। শিষ্য যাতে অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে পারে তার জন্য শিক্ষা অব্যাহত রাখতে হয়। দীক্ষা তাই প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা মাত্র। দীক্ষার পর শিষ্যের অবশ্যই পূর্ণতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে হবে।

গুরু সাধু ও শাস্ত্র অনুশীলন

'গুরু সাধু শাস্ত্রবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য'

(নরোত্তম দাস ঠাকুর)

এটাই আধ্যাত্মিক সফলতার পথ। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে নিজের মন গড়া ভাবে কাজ করার ঝোঁক রয়েছে। মূল বিষয়ের সাথে নিজস্ব দর্শন জুড়ে দেয়া, নির্ধারিত মানসম্মত নিয়মাবলীর পরিবর্তন সাধন করা অথবা তাল গোল পাকিয়ে ফেলা কাউকে ধর্মীয় নেতা রূপে মেনে নেয়ার ইচ্ছা ও আমাদের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ-এর ফলে আমরা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাব। প্রত্যেকের উচিৎ অতীতের আচার্যদের নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা। তাহলেই জীবন সার্থক হবে।

ভক্তি ও ব্যবসা

আর্থিক লাভের জন্য ভক্তিমূলক তৎপরতা চালানো উচিৎ নয়। কারও উচিত নয় পেশাদার কীর্তনের দলে যোগ দেয়া; শিষ্যদের কাছ থেকে প্রণামী গ্রহণের উদ্দেশ্যে গুরু হওয়া এবং টাকার বিনিময়ে ভাগবত পাঠ করা। এত করে নিজের আধ্যাত্মিক জীবন নষ্ট হয়ে যায় এবং অন্যরা প্রতারিত হয়। অবশ্য কেবলমাত্র কৃষ্ণের সেবার জন্য একজন প্রকৃত প্রচারক দান গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু কৃষ্ণনাম এবং ভাগবতকে পরিবার চালানোর মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা অত্যন্ত হীন কাজ এবং সকল শুদ্ধ বৈষ্ণব এর নিন্দা করেন। ভক্তির নামে আত্মপ্রচারণা উচিৎ নয়। এটা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার পরিপন্থী। বৈষ্ণবরূপে নিজেকে জাহির করে সম্মান, পূজা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন খুবই সহজ। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব হওয়া এবং কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা তত সহজ নয়।

ভক্তের পরিবার

যদি গোটা পরিবারই কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে উঠে তবে খুব সুন্দর হয়। অবশ্য আমরা প্রায়ই দেখি যে, পরিবারের দু'একজন সদস্যের মধ্যে কৃষ্ণ ভাবনার স্ফুরণ হচ্ছে। বাকীদের মধ্যে নয়। কোন কোন সময় পরিবারের এসব সদস্যরা তাদের আত্মীয়দের কৃষ্ণ ভাবনায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। এধরনের দুর্বল পরিস্থিতিতে ধৈর্য্যের দৃঢ়তা, প্রার্থনা ও প্রবীণ ভক্তদের কাছ থেকে দিক নির্দেশনা গ্রহণ প্রয়োজন। কিন্তু জীবনের শরীরগত ধারনার আবেগ জড়িত থাকার কারণে আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃত পরিত্যাগ করতে পারি না এবং এ ব্যাপারে কিছু প্রাসঙ্গিক উক্তিঃ- ভক্তের পরিবারের সদস্যরাও ভগবানের প্রতি তার সেবার ফলে অংশ পায়। 'পরিবারে একজন ভক্তপুত্র ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ (ভাগ ১, ১৯, ২ পৃঃ)।

'ভক্তেরপরিবারের সদস্য এবং উত্তরাধিকারীদের ভগবান বিশেষ ভাবে রক্ষা করেন। এমনকি পরিবারের ঐসব সদস্যরা ভক্ত না হলেও তারা ভগবানের আশীর্বাদ পায়' (ভা ১, ১৯, ৩) 'ভক্ত হয়েও কেহ পরিবারের জন্য সর্বোত্তম কাজ করতে পারে, যদিও তারা তা বুঝতে পারে না' (ভা ২, ৫, ৮১)।

ইস্‌কনের সদস্য হোন

সকল শাস্ত্রগ্রন্থে এ উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, আধ্যাত্মিক অগ্রগতির জন্য শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রয়োজন। শুদ্ধ ভক্তদের সমিতি গড়ার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ ইসকন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যাতে অন্যরাও এতে যোগদিয়ে ভক্তসঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

যদি কিছু সংখ্যক আগ্রহী ব্যক্তি হরে কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন ও কৃষ্ণকথা আলোচনার জন্য নিয়মিত মিলিত হতে চান তবে তাঁরা ইসকনের নির্দেশানুসারে একটি নামহট্ট সংঘ গড়ে তুলতে পারেন।

আধ্যাত্মিক জীবনে প্রকৃত অগ্রগতির জন্য সদগুরু গ্রহণ অপরিহার্য। ইসকনের কোন কোন সদস্যকে যোগ্য লোকদের ব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার দেয়া হয়েছে। যদি কেউ প্রয়োজনীয় সকল নিয়মকানুন মেনে চলার ব্যাপারে নিষ্ঠাবান হন তবে তিনি এ ধরণের কোন একজন গুরুর শিষ্য হতে পারেন।

তরুণ অথবা যুবক বয়সের যে কোন লোক আমাদের আশ্রমে এসে কয়েকবছর অথবা আজীবন ব্রহ্মচারীরূপে থাকতে এবং বৈষ্ণব শাস্ত্র, কীর্তন, পূজাও দর্শন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিতে পারে। তারপর সে আমাদের ভক্তদের সাথে সারা বাংলাদেশ ভ্রমণ করে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করার সুযোগ পাবে। কৃষ্ণের জন্য গৌরবময় আত্মত্যাগের এ জীবন নির্মল আনন্দে পরিপূর্ণ।

ইসকনের কাজে সহায়তাকল্পে আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনায় আগ্রহী যে কোন ব্যক্তি ৫৫৫৫/- টাকা দিয়ে ইসকনের আজীবন সদস্র হতে পারেন। আজীবন সদস্যরা ইসকনের কাছ হতে বিভিন্ন সুবিধাদি পেয়ে থাকেন।

বিভিন্ন ধরণের সদস্যপদের জন্য আরও তথ্য জানতে হলে আপনার সবচেয়ে নিকটবর্তী শাখার সাথে অনুগ্রহপূর্বক যোগাযোগ করুন। (এই পুস্তকের প্রথম দিকে ঠিকানা রয়েছে)।

ভক্তিগীতি

নীচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ গান ও প্রার্থনার তালিকা দেয়া হলো।
বিশ্বের সর্বত্র ইসকনের মন্দিরসমূহে এগুলো গাওয়া হয়। ইসকন এসমস্ত গান ও বই প্রকাশ করেছে।

গানের প্রথম কলি	কখন গাইতে হবে
সংসার দাবানল	মঙ্গল আরতি
নমস্তে নরসিংহায়	প্রত্যেক আরতির পর
তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী	তুলসী আরতি
শ্রীগুরু চরণ পদ্ম	গুরুপূজা
শরীর আবিদ্যা জলে	প্রসাদ সেবার আগে
জয় রাধা মাধব	পাঠ গুরুর আগে
জয় জয় গোরাচাঁদের আরতি	সন্ধ্যা আরতি

শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টকম্

সংসার-দাবানল-লীঢ় লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ১॥

সংসার-দাবানল-সন্তপ্ত সমস্ত লোকের পরিত্রাণের জন্য
যিনি কারুণ্য)-বারিবাহ তরলত্ব প্রাপ্ত হয়ে কৃপাবারি
বর্ষণ করেন, আমি সেই কল্যাণগুণনিধি শ্রীগুরুদেবের
পাদপদ্ম বন্দনা করি।

মহাপ্রভোঃ কীর্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ২॥

সংকীর্তন, নৃত্য গীত ও বাদ্যাদি দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর
পেমরসে উন্মত্ত-চিত্ত যাঁর রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু-তরঙ্গ
উদগত হয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

শ্রী বিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দির মার্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংচ নিযুঞ্জতোহপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৩ ॥

যিনি শ্রীবিগ্রহের বেশ-রচনা ও শ্রীমন্দির-মার্জন প্রভৃতি নানাবিধ সেবায় স্বয়ং নিযুক্ত থাকেন এবং (অনুগত) ভক্তগণকে নিযুক্ত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

চতুর্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ-
স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৪ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তবৃন্দকে চব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়-এই চতুর্বিধ রসসমন্বিত সুস্বাদু প্রসাদান্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত ক'রে (অর্থাৎ প্রসাদ-সেবন জনিত প্রপঞ্চ - নাশ ও পেমানন্দের উদয় করিয়ে) স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার-
মাধুর্যলীলা গুণ-রূপ-নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৫ ॥

যিনি শ্রীরাধামাধবের অনন্ত মাধুর্যময় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসমূহ আস্বাদন করার নিমিত্ত সর্বদা লুব্ধচিত্ত, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

নিকুঞ্জযূনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ
যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরো ঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৬ ॥

নিকুঞ্জবিহারী ব্রজযুবযুগলের রতিক্রীড়া সাধনের নিমিত্তে সখীগণ যে যে যুক্তির অপেক্ষা ক'রে থাকেন, সেই সমস্ত বিষয়ে অতি নিপুণতাপ্রযুক্ত যিনি তাঁদের অতিশয় প্রিয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরো ঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৭ ॥

নিখিলশাস্ত্র যাঁকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহ-রূপে কীর্তন করেছেন এবং সাধুগণও যাঁকে সেইরূপেই চিন্তা করে থাকেন, কিন্তু যিনি ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

যস্য প্রসাদাদভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদন্ন গতিঃ কুতোহপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরো ঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৮ ॥

একমাত্র যাঁর কৃপাতেই ভগবদ-অনুগ্রহ লাভ হয়, এবং যিনি অপ্রসন্ন হলে জীবের আর কোথাও গতি থাকে না, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই শ্রীগুরুদেবের কীর্তিসমূহ স্তব ও ধ্যান করতে করতে তাঁর পাদপদ্ম বন্দনা করি।

শ্রীতুলসী আরতি

নমো নমঃ তুলসী ! কৃষ্ণপ্রেয়সী !
রাধাকৃষ্ণ-সেবা পাব এই অভিলাষী ॥
যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবনবাসী।
মোর এই অভিলাষ, বিলাস-কুঞ্জে দিও বাস,
নয়নে হেরিব সদা যুগলরূপরাশি ॥
এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগত কর,
সেবা-অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী।
দীন কৃষ্ণদাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমে সদা যেন ভাসি ॥

রাধামাধব কুঞ্জবিহারী।
গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী।
যশোদানন্দন, ব্রজজনরঞ্জন,
যামুনতীর-বনচারী ॥

প্রসাদ-সেবায়

প্রসাদ-সেবনারম্ভে –

ভাইরে!
শরীর অবিদ্যা-জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তা'র মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্মতি,
তা'কে জেতা কঠিন সংসারে ॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ-অন্ন দিলা ভাই।
সেই অন্নামৃত খাও, রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই ॥

শ্রীগৌর-আরতি

জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা।
জাহ্নবী-তটবনে জগমনোলোভা ॥ ১ ॥
দক্ষিণে নিতাইচাঁদ, বামে গদাধর।
নিকটে অদ্বৈত, শ্রীনিবাস ছত্রধর ॥ ২ ॥
বসিয়াছে গোরাচাঁদ রত্নসিংহাসনে।
আরতি করেন ব্রহ্মা-আদি দেবগণে ॥ ৩ ॥
নরহরি-আদি করি' চামর ঢুলায়।
সঞ্জয়-মুকুন্দ-বাসুঘোষ-আদি গায় ॥ ৪ ॥
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল ॥ ৫ ॥
বহুকোটি চন্দ্র জিনি' বদন উজ্জ্বল।
গলদেশে বনমালা করে ঝলমল ॥ ৬ ॥
শিব-শুক-নারদ প্রেমে গদগদ।
ভকতিবিনোদ দেখে গোরার সম্পদ ॥ ৭ ॥

শ্রীনৃসিংহদেবের প্রণাম ও স্তব

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥

☆ ☆ ☆ ☆

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃত - নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হ'তে ॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম-গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব আশা ॥
চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাহার চরিত ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম-জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভো কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুন ॥

প্রেমধ্বনি

প্রেমধ্বনি বিশেষ করে আরতি কীর্তন সমাপনান্তে করা হয়।

প্রথমে একজন ভক্ত প্রেমধ্বনি করে এবং দন্ডবৎ অবস্থায় সমবেত ভক্তরা একসাথে জয়ধ্বনি করে

জয় ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমত শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী
প্রভুপাদ কি (জয়)।
অনন্ত কোটি বৈষ্ণববৃন্দ কি (জয়)।
নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কি (জয়)।
প্রেমসে কহ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ কি (জয়)।
শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ গোপ গোপীনাশ, শ্যামকুন্ড, রাধাকুন্ড, গিরি গোবর্ধন কি (জয়)।
বৃন্দাবন ধাম কি (জয়)।
নবদ্বীপ ধাম কি (জয়)।
জগন্নাথ পুরী ধাম কি (জয়)।
গঙ্গামায়ি কি (জয়)।
যমুনা মায়ি কি (জয়)।
ভক্তি দেবী কি (জয়)।
তুলসী দেবী কি (জয়)।
সমবেত ভক্তবৃন্দ কি (জয়)।
গৌর প্রেমানন্দে হরি বোল।

এটা সাধারণ প্রেমধ্বনি। ভক্তরা এইভাবে প্রেমধ্বনি করে থাকে। আরও বিস্তারিত ভাবেও করা যায়।

শেষ কথা

শ্রীল প্রভুপাদ কহিলেন-
'আগ্রহ অব্যাহত রাখ। সাফল্য সম্পর্কে আস্থারাখ। নির্দেশ ও নীতিমালা সমূহ অনুসরণ কর। সরল হও। ভক্ত সঙ্গে থাক। ধৈর্যশীল হও। হতাশ হবে না এবং কৃষ্ণ অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবেন।'
'ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে মত্ত থেকে গোটা বিশ্বের মানুষ তাদের মানব জন্ম ব্যর্থ করে ফেলছে। ফলে পরবর্তী জীবনে তাদের জন্য পশু অথবা তার চেয়েও অধম যোনিতে জন্মগ্রহনের ঝুঁকি রয়েছে। কৃষ্ণ ভাবনা জাগ্রত করে মানব সমাজকে অবশ্যই এই ঝুঁকিপূর্ণ সভ্যতা ও পশুত্বের বিপদ থেকে রক্ষা করতে হবে। এ কারণেই কৃষ্ণ ভাবানামৃত আন্দোলন শুরু করা হয়েছে।'
' আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের সংকীর্তন আন্দোলন এই বস্তুগত জগতের মধ্যেই উদ্বেগশূণ্য চিন্ময় বিশ্ব বৈকুণ্ঠ গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত।'

পরিশিষ্ট

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ (ইসকন International Society for Krishna Conciousness- ISKCON) :- সুসংগঠিত পন্থায় বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনা বিস্তারের লক্ষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৬৬ সালে এ সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।
গৌরকিশোর দাস বাবাজী ঃ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের গুরু।
পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র ঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু, নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।
প্রভুপাদ, শ্রীল প্রভুপাদ ঃ ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমৎ এ, সি, ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ -এর সংক্ষিপ্ত নাম। যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে বিশেষ অবদান রেখেছেন তেমন গুটি কয়েক আচার্যের ক্ষেত্রে এই বিশেষ সম্মানসূচক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। এ সম্মানে ভূষিত অন্যান্যের মধ্যে রয়েছেন শ্রীলরূপ গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু-পাদ এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ।
বিষ্ণুতত্ত্ব ঃ বিভিন্ন রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যেমন ঃ রাম, নৃসিংহ, নারায়ণ, চৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈতাচার্য, শালগ্রাম শিলা।
ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ঃ- উনবিংশ শতকের মহান বৈষ্ণবাচার্য, পন্ডিত এবং কবি।
ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ঃ ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের পুত্র। সর্বকালের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ভাবনা প্রচারক এবং সুপন্ডিত। তিনি ৬৪ টি গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনি ব্যাপকভাবে কৃষ্ণভাবনার প্রচার চালান। তিনি এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভু-পাদ এবং আরও অনেক স্বনামধন্য বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর গুরু।
মহামন্ত্র ঃ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
শ্রীল ঃ বৈষ্ণবগুরুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শণের জন্য এই শব্দ ব্যবহৃত হয়।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

চৈঃ চঃ - চৈতন্য চরিতামৃত　　　চৈঃ ভাঃ - চৈতন্য ভাগবত

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করুন!

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে